নতুন তারা

নতুন তারা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থম
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ ১৩৫১

পরিবর্ধিত গ্রন্থম সংস্করণ : ২৮শে পৌষ, ৩৬৬

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সাহা

গ্রন্থম

২২।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

একমাত্র পবিবেশক

পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

১২।১, লিণ্ডসে স্ট্রিট,

কলিকাতা ১৬

মুদ্রক :

সুনীল কুমার রুদ্র

রুদ্র অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

(মুদ্রণ বিভাগ)

৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ পট : বিভূতি সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট

শোভন সংস্করণ দাম : তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

ছুটি

পাত্র-পাত্রী

কুলেন্দ্র সিং

শিবতোষ দাস

মেঘমালা

বেয়ারা

[কুলেন্দ্র সিং-এর অফিস ঘর। যেমনটি হবার তেমনি। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। মিস্টার সিং ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন, চেয়ারে বসে। সামনের টেবিলে রাশীকৃত বিশৃঙ্খলা। হাতের এ কাজটুকু সেরে এখুনি উঠে পড়বেন, সিং-এর এমনি ত্বরান্বিত ভাব। হঠাৎ খোলা দরজার পর্দা ঠেলে শিবতোষ সবেগে ঢুকে পড়ল। উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যস্তসমস্ত। বেশবাস পারিপাট্যহীন। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ।]

সিং। (বিস্মিত ও বিরক্ত) এ কি? হু আর ইউ?

শিবতোষ। আমি স্যার—আমি।

সিং। (সগর্জন) কে তুমি?

শিবতোষ। চিনতে পাচ্ছেন না? আমি শিবতোষ দাস। আপনার আফিসের প্যাকিং ডিপার্টমেণ্টের নগণ্য কর্মচারী। মাইনে পঁয়তাল্লিশ টাকা, মাগ্‌গি ভাতা—

সিং। (ধমকের সুরে) তা, তুমি এখানে, আমার বাড়িতে আমার বসবার ঘরে ঢুকলে কি করে?

শিবতোষ। প্রায় একরকম জোর করেই ঢুকতে হয়েছে, স্যার। নইলে উপায় ছিল না।

সিং। উপায় ছিল না? হোয়াট দি ডেভিল ডু ইউ মিন? তোমার কার্ড কই? কার্ড পাঠাওনি কেন?

শিবতোষ। ও সব কার্ড-ফার্ড কোথায় পাব? অত কায়দাদুরস্ত হওয়া কি আমাদের পোষায়? কাগজ-টাগজের দাম কত আজকাল। কেনবার পয়সা কোথায়?

সিং। কে কিনতে বলছে তোমাকে? দরজার বাইরে পেরেক ঝোলানো কাগজের স্লিপ ছিল না? তাতে নাম আর দেখা করার উদ্দেশ্য লিখে পাঠাওনি কেন?

শিবতোষ। ঐ স্লিপে যদি লিখে পাঠাতাম তা হলে আর দেখাই করতে পারতাম না আপনার সঙ্গে।

সিং। দেখাই করতে পারতে না?

শিবতোষ। হ্যাঁ, তা হলে আমাকে আর ডাকতেনই না আপনি। বাইরে ঐ কাঠের বেঞ্চিটার উপরে বসিয়ে রাখতেন। ভিতরে স্লিপ পাঠিয়ে অমনি কয়েকজন এখনো বসে আছে অপেক্ষা করে।

সিং। আমার হাতের কাজ শেষ হলে তো তাদের ডাকব।

শিবতোষ। নিশ্চয়ই। ওদের কাজের আর দাম কি! ওরা বোকা, ভীরু, চুপচাপ বসে থাক ওরা সৃষ্টির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বাইরে অমনি বসিয়ে রাখায় খুব একটা পৌরুষ আছে। আপনি যে একজন ডাকসাইটে বড়লোক, আপনার যে অনেক শক্তি, অনেক মর্যাদা তা প্রকাশ করার রীতিই হচ্ছে দর্শনার্থীদের দরজার বাইরে অমনি বসিয়ে রাখা। কিন্তু আমার কাজ অত্যন্ত জরুরি। অনর্থক বসে থাকবার আমার সময় নেই।

সিং। তাই বলে তুমি না বলে-কয়ে আমার অনুমতি না নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়বে?

শিবতোষ। মাপ করুন, আমি অনুপায়। আপনি তো জানেন, আমার সময় বড্ড কম। বিকেল তিনটের ট্রেনেই আমাকে বেরুতে হবে।

সিং। (সজোরে কলিং বেলে হাতের বাড়ি মারলেন) ব্যেরা! ব্যেরা! (বেয়ারার প্রবেশ) একে কার্ড ছাড়া আমার অফিস-ঘরে ঢুকতে দিয়েছ কেন?

বেয়ারা। আমি দিইনি, হুজুর। উনি আমাকে জোর করে ঠেলে ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে।

সিং। আর তুমি ওকে ঠেকাতে পারলে না?

শিবতোষ। আজ কেউই আমাকে ঠেকাতে পারবে না।

সিং। (বেয়ারাকে) কি, কথা কইছ না কেন? গায়ে জোর নেই?

শিবতোষ। রেশনের চাল খেয়ে-খেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে।

সিং। (বেয়ারাকে) এমনি যখন তোমার গায়ের জোর, ধাক্কা

খেয়ে যদি তুমি পথ ছেড়ে দাও, তবে এখানে আর তোমার চাকরি করে কাজ নেই। তুমি পথ দেখ।

বেয়ারা। আমার কোনো কসুর নেই, হুজুর। আমি ওঁকে বললাম সিলিপে নাম লিখে দিন, সিলিপ ছাড়া ঢোকবার আইন নেই। উনি বললেন, সিলিপের দরকার হবে না, সাহেব আমাকে চেনেন, আর কাজটি অফিসের কাজ, ভীষণ জরুরি—এক মিনিট দেরি করার সময় নেই।

শিবতোষ। দুটো কথাই সত্য। প্রথমত আমাকে আপনি চেনেন, আপনার আফিসের আমি একজন নিচু কর্মচারী। চেনা বামুনের যেমন পৈতের দরকার নেই, তেমনি আফিসের কেরানিরও স্লিপের দরকার নেই। ঘরে ঢুকতে বেয়ারার যদি না স্লিপ লাগে তবে আমারই বা লাগবে কেন? দ্বিতীয়ত যে কাজের জন্য এসেছি সেটাকে আফিসের কাজই বলতে হয়।

সিং। (বেয়ারাকে) তোমাকে বেযারা রাখা আমার আর পোষাবে না। তুমি একটি গিদ্ধড। গায়ের জোরে তুমি একটা রোগা পটকা কেরানির সঙ্গে পারো না। যাও।

শিবতোষ। সরাসরি কুস্তি করতে হলে নিশ্চয়ই পারত। হেরে গেছে বুদ্ধির জোরের কাছে। তা ছাড়া ওর চাকরিতে নিশ্চয়ই এমন কোনো সর্ত ছিল না যে কেউ স্লিপ না পাঠিয়ে ঘরে ঢুকতে চাইলেই তার সঙ্গে একটা ধস্তাধস্তি করবে।

সিং। একশোবার করবে। তা নইলে চোর-ডাকাত বাটপাড়-জোচ্চোর যে কেউই ভাওতা মেরে ঢুকে পড়বে না কি?

বেয়ারা। যদি হুকুম করেন তো এখুনি ঘাড় ধরে ঘরের বার করে দি।

শিবতোষ। এখন আর ওর জুরিসডিকশন নেই। এখন আমি মফস্বল ছেড়ে সদরে চলে এসেছি, একেবারে খোদ রাজধানীতে।

বেয়ারা। যদি বলেন তো চ্যাং-দোলা করে তুলে নিয়ে এখুনি ছুঁড়ে ফেলে দি বাইরে।

সিং। না। তার আগে তোমাকেই বার করে দিলাম। তোমার চাকরি ছুটে গেল আজ থেকে। তুমি পথ দেখ।

বেয়ারা। সাব, মাফ করুন। আর কখনো এমন হবে না।

শিবতোষ। দেখ, এখন আর ঝামেলা বাড়িও না। আমার ব্যাপারটি শেষ হবার আগে তুমি যদি একটা নতুন নাটক সুরু কর, তবে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। পথ দেখতে বলছেন, পথ দেখ। তোমাদের ভাবনা কি। একটি গেছে আর একটি জুটবে। তোমরা তো আর বাঙালী নও।

বেয়ারা। (সকাতর) সাব, হুজুর, এ বার মাফ করুন। আর কখনো এমন গাফিলতি হবে না।

সিং। না। যা একবার হুকুম হয়ে গেছে তার আর নড়চড় নেই। যাও, তুমি চাকরির থেকে বরখাস্ত হয়ে গেলে। যাও। আর যারা বসে আছে বাইরে, তাদেরও চলে যেতে বল। কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও। নিকালো। (বেয়ারার প্রস্থান) তারপর, তুমি কি চাও?

শিবতোষ। স্যার, আমার সেই ছুটির দরখাস্তটা ফের নিয়ে এসেছি।

সিং। ছুটির দরখাস্ত?

শিবতোষ। হ্যা স্যার, দিন পনেরো ছুটি চাই। কম করে অন্তত দশ দিন।

সিং। ছুটি? ছুটি কেন?

শিবতোষ। আমার জ্যেঠামশায়ের মারাত্মক অসুখ, কাল টেলিগ্রাম এসেছে বিকেলে। আমাকে দেখতে চাচ্ছেন।

সিং। ও, তুমি তাই বলে কাল অফিসে একটি দরখাস্ত করেছিলে। তাই না?

শিবতোষ। করেছিলাম। আর আপনি তা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছিলেন।

সিং। সেই দরখাস্ত আবার পেশ করতে এসেছ?

শিবতোষ। না স্যার, নতুন করে লিখে নিয়ে এসেছি আর একটা।

সিং। একবার যে দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেছি, পরে আবার তাই মঞ্জুর করব এই কি তোমার বিশ্বাস?

শিবতোষ। আপনার মহানুভবতায় আমার বিশ্বাস হারাবার কোনো কারণ ঘটেনি। যে দরখাস্তটি অগ্রাহ্য করেছিলেন সেটা আফিসে দিয়েছিলাম, সেটি আফিসের দরখাস্ত। এবারের দরখাস্তটি আপনার বাড়িতে নিয়ে এসেছি, এটির এখন অন্য রকম চেহারা, অন্য রকম পরিবেশ। আফিসে আপনি সাহেব, বিদেশী; বাড়িতে আপনি গৃহস্থ, ভদ্রলোক।

সিং। তাই বুঝি বাড়িতে এসেছ দরখাস্ত নিয়ে? ভুল, ভুল করেছ তুমি। আমি অফিসে যা বাড়িতেও তাই। আমি এক কথার মানুষ। আমার হুকুম কখনো নড়চড় হয় না। অফিসে যা না বলে দিয়েছি বাড়িতে তা কখনোই হ্যাঁ হবার নয়। কিছুতেই নয়। সেই না না-ই থাকবে। সুতরাং পথ দেখ।

শিবতোষ। এখুনি যদি পথ দেখি তবে পথেই আপনার বেয়ারার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আর রাস্তায় একবার পেলে সে আর আমাকে আস্ত রাখবে না।

সিং। আচ্ছা, এসেছ ছুটি নিতে, অফিসের ছোট একটা কেরানি, কন্তু এমন ইয়ার্কি করে কথা কইছ কেন? কার সঙ্গে কথা কইছ খেয়াল নেই?

শিবতোষ। একেকবার খেয়ালটা আসে, আবার হারিয়ে যায়। আমার মাথা খারাপ হয়ে উঠছে ক্রমশ। কাল আপনার অর্ডার পাওয়ার

পর থেকেই মাথার ভেতরটা কেমন গরম হয়ে গেছে, তাল-মান, কথাবার্তা কিছু ঠিক থাকছে না। চোখে কেমন ধোঁয়া দেখছি। কখনো দেখছি সাহেব, কখনো দেখছি কাঁচকলা। যদি এ-দরখাস্তটাও অগ্রাহ্য হয়, তবে আমি নির্ঘাৎ উন্মাদ হয়ে যাব।

সিং। তাই হও। তোমার ছুটি হবে না।

শিবতোষ। হবে না? তবে আমার উপায় কী হবে?

সিং। তার আমি কি জানি!

শিবতোষ। আপনি না জানলে কে জানবে স্যার? আপনি আমার মুনিব, আপনার তাঁবেদারি করে বেঁচে আছি। আপনি যদি না দয়া করেন—

সিং। এটা হচ্ছে ডিউটি, ডিসিপ্লিনের কথা। কর্তব্যের কাছে দয়ামায়া, পাপ-পুণ্য কিছু নেই। এ সময়ে অফিসের কাউকে ছুটি দেওয়া যাবে না।

শিবতোষ। এ সময়ে অসুখ তো হতে পারে। অসুখ তো আর ডিসিপ্লিন মানে না।

সিং। তা, তোমার তো নিজের অসুখ নয়।

শিবতোষ। নয়। কিন্তু তাই অনায়াসে বানিয়ে বলতে পারতাম, স্যার। সঙ্গে ডাক্তারের সার্টিফিকেটও দিয়ে দিতে পারতাম অনায়াসে। টাকা দিয়ে সহজেই ঐ সার্টিফিকেট কেনা যায় বাজারে। দেখুন, আমি মিথ্যের ধার দিয়েও যাইনি। যা সত্য তাই বলেছি সোজাসুজি।

সিং। বাবা-জেঠা, মা-মাসির অসুখে ছুটি দিতে গেলে অফিস তুলে দিতে হবে এক দিনেই।

শিবতোষ। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা যান। জেঠামশাইই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। মানুষ যদিও হইনি ষোল আনা। তবু জেঠামশায়ের অসুখে তাঁর শেষশয্যার কাছে না গিয়ে পারব না, স্যার। জেঠামশাই আমার বাবা-মার চেয়েও বেশি।

সিং। রট। দেখ, এটা আমাদের সাহেবি অফিস। ছুটির বেলায় আমরা বাবা-মা ভাই-বোন জেঠা-কাকা মামা-মেসো কিছু স্বীকার করি না। একমাত্র স্বীকার করি স্ত্রী। কারু স্ত্রীর যদি অসুখ করে তবেই একমাত্র বিবেচনা করতে পারি।

শিবতোষ। আমি হতভাগ্য, স্যার। আমার স্ত্রী নেই। আমি এখনো বিয়েই করিনি।

সিং। না করাটা অন্যায় হয়েছে।

শিবতোষ। এখন বুঝতে পারছি। বিয়ে করা থাকলে একটি ব্যারাম ঘটিয়ে ফেলায় বোধ হয় কোনো অসুবিধে হত না। কিন্তু যা নেই তা ভেবে লাভ কি ?

সিং। উপায় কী জিগগেস করছিলে না ? উপায় হচ্ছে বিয়ে। যাও, বিয়ে করো গে।

শিবতোষ। আপনিও তো স্যার, সেই ইয়ার্কি করেই কথা বলছেন। জ্বলন্ত আগুনে আর আহুতি দেবেন না।

সিং। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। বর্তমান তো গেছে, এখন ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হও।

শিবতোষ। কিন্তু আমার বতমান এখনো যায়নি। বিকেল তিনটের সময় ট্রেন। এখনো ঢের সময় আছে।

সিং। কিন্তু আমার আর সময় নেই। আমাকে অফিসে বেরুতে হবে। তুমি যাবে না অফিস ?

শিবতোষ। কি করে যাই, স্যার ? যেটুকু সময় আছে, তারি মধ্যে বিয়ে করে স্ত্রীর অসুখ বাধিয়ে ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নেবার শেষ চেষ্টা তো করতে হবে। কিন্তু তেমন স্ত্রী পাই কোথায় ? হাসপাতালে যাব ? সরাসরি রুগ্ণী মেয়ে বিয়ে করলে চলবে, স্যার ?

সিং। কিছুই চলবে না। আগে যা বলেছি, পথ দেখ।

শিবতোষ। ছুটি ছাড়া আমার আর পথ নেই। জেঠামশায়ের ছেলে নেই, আমিই তাঁর ছেলে। তিনি আজ মরণাপন্ন অসুস্থ—

সিং। কিন্তু অফিসের কাজ তার চেয়েও বেশি জরুরি। ফ্যাক্টরির মেশিন বন্ধ হতে পারে না এক মুহূর্ত।

শিবতোষ। আর মানুষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মিনিটে-মিনিটে। মেশিনের আজ প্রবল প্রতাপ, সবগ্রাসী ক্ষুধা। কিন্তু যাই বলুন, ক্ষুধার্ত মানুষেরই শক্তি বেশি। ক্ষুধার্ত মানুষই আবার বন্ধ করে দিতে পারে ও মেশিনের দৌরাত্ম্য।

সিং। তুমি না ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চেয়েছিলে? যার জন্যে স্লিপ পাঠাবার পর্যন্ত তর সয়নি? তবে কেন আর দেরি করছ? তোমার আর্জি এক ডাকেই খারিজ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছি তোমার কথামত।

শিবতোষ। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা তাড়াতাড়িতে আপনি ঠিকমত বুঝতে পাচ্ছেন না, স্যার। তাই নিরিবিলিতে ভাল করে বোঝাবার জন্যে আমি আপনাকে বাড়িতে এসে ধরেছি।

সিং। আমি বুঝতে পারছি না? সমস্ত জিনিস খুব ভাল করে বুঝতে পারি বলেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে উন্নতির চূড়ায় এসে উঠেছি। আমিও আরম্ভ করেছিলাম পঞ্চাশ টাকায়। বুঝলে?

শিবতোষ। আমার চেয়ে পাঁচ টাকা তবে বেশি, স্যার। আর তখনকার দিনের পাঁচ টাকা এখনকার পঁচিশ টাকার সমান।

সিং। কোনোদিন ছুটি নিইনি। দৈত্যের মত কাজ করেছি।

শিবতোষ। কিন্তু এখন দৈত্যের মত ব্যবহার করবেন না, স্যার! জেঠামশাই উন্মুখ হয়ে আমার জন্যে মুহূর্ত গুনছেন।

সিং। কোনোদিন সেন্টিমেন্টের ধার ধারিনি। বুঝলে হে ছোকরা, ইনটেলিজেন্স! ইনডাসট্রি। এফিসিয়েন্সি।

শিবতোষ। প্রত্যেকটা কথার খুব ভাল ভাল বাঙলা ছিল, স্যার। আমার মাথাটা খারাপ না হয়ে গেলে ঠিক বলে দিতে পারতাম। কিন্তু কথা তা নয়। কথা হচ্ছে আমাকে না দেখে জেঠামশাই চোখ বুজতে পারছেন না। আমার উপর আপনারই শুধু দাবি, তাঁর কোনোই দাবি নেই? আমার কি উচিত নয় তাঁকে একটি বার শেষ দেখা দেখে আসা?

সিং। এতই যখন জেঠামো, তখন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাও।

শিবতোষ। চাকরি চলে গেলে খাব কি, স্যার?

সিং। তা হলে জেঠামো ছাড। হয় জেঠা নয় চাকরি।

শিবতোষ। দুঃখের মাঝে কটা দিনের ছুটির একটা সাঁকো, নড়বড়ে সাঁকো। জেঠামশাইকে বিদায় দিয়ে এই সাঁকো বেয়ে ঠিক আবার চলে আসব।

সিং। না, না, হবে না ছুটি। (শব্দ করে চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়লেন) কিছুতেই না।

শিবতোষ। আপনার পায়ে পড়ছি, স্যার।

সিং। হোয়াট?

শিবতোষ। সত্যিই পায়ে পড়ছি, স্যার। এই পায়ে পড়ার জন্যেই আপনার বাড়িতে এসেছি।

সিং। হোয়াট ডু ইউ সে?

শিবতোষ। হ্যাঁ, স্যার। আফিসে সবার সামনে পায়ে পড়তে ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল, স্যার। এখন এই একা ঘরে আমার আর কোনো লজ্জা নেই। আমাকে অন্তত দিন সাতেকের ছুটি দিন। (পায়ে পড়ল)

সিং। এ কি উৎপাত! এ কি নুইসেন্স।

শিবতোষ। হৃদয় দিয়ে না বোঝেন স্যার, পা দিয়ে হৃদয় বুঝুন এই গরিব কেরানির। মাথা আমার কী রকম খারাপ হয়ে গিয়েছে বুঝুন মাথায়

পা ঠুকে। দশ দিন না হয়, অন্তত সাত দিন আমাকে ছুটি দিন। আমি শুধু যাব আর আসব।

সিং। ইমপসিবল। শেষকালে তুমি গায়ের জোর দেখাবে?

শিবতোষ। আমি গায়ের জোর দেখাব না স্যার, আপনিই বরং পায়ের জোর দেখান। তবু আমাকে ছুটি দিন। আমার চোখের আড়ালে জেঁঠামশাই মারা গেলে আমি উদ্দাম পাগল হয়ে যাব।

সিং। রট! (বেল টিপল) ব্যেরা! ব্যেরা!

শিবতোষ। ও আসবে না, স্যার। ওকে ডাকা বৃথা। চাকরি থেকে ও বরখাস্ত হয়ে গেছে।

সিং। পা ছাড়ো বলছি। নইলে চাকরি থেকে তুমিও বরখাস্ত হয়ে যাবে।

শিবতোষ। পায়ে পড়ার জন্যে লোকে বরখাস্ত হয় না, স্যার, বরং তাতে তার উন্নতি হয়।

সিং। তোমার লজ্জা করছে না? সামান্য কটা দিনের ছুটির জন্যে এমনি করে নিচু হচ্ছ?

শিবতোষ। যদি তাতে আপনার একটু লজ্জা হয়, আপনার মনুষ্যত্বটা জেগে ওঠে।

সিং। আমি হলে সটান চাকরিতে ইস্তফা দিতাম।

শিবতোষ। আপনার পাঁচ টাকা মাইনে বেশি ছিল স্যার, যে পাঁচ টাকা আজকালকার পঁচিশ টাকার সমান। আপনি পাঁচগুণ বেশি খেতেন। আপনার গায়ে পাঁচগুণ বেশি জোর ছিল। আপনার পিছনে মামা ছিল শ্বশুর ছিল, হয়ত বা মাসতুত ভাই ছিল অনেকগুলি। আমার মত আপনি এমনি নিঃসম্বল ছিলেন না। আমার মত মাথা খারাপ হয়ে যায়নি আপনার।

সিং। এবার যাবে। এবার আমিও নিশ্চয় পাগল হয়ে উঠব।

শিবতোষ। (উঠে দাঁড়াল) না স্যার, আপনি পাগল হলে সর্বনাশ। আপনি অন্তত মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। আমরা ভূতের কেরানি, আমাদেরই মাথার বরং কোনো দাম নেই। একটুতেই বিগড়ে যেতে চায়।

সিং। বেশ, মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বলছি। এখুনি চলে যাও বাড়ি ছেড়ে।

শিবতোষ। কিন্তু ছুটি—

সিং। ছুটি হবে না।

শিবতোষ। আমার ছুটি না হলে আপনারই বা ছুটি হয় কি করে, স্যার?

সিং। যাও, বেরিয়ে যাও বলছি। নইলে আমি পুলিশ ডাকব।

শিবতোষ। পুলিশ! এসে আমাকে ছুটি দেবে?

সিং। পুলিশ এসে তোমাকে য়্যারেস্ট করবে।

শিবতোষ। কেন স্যার, আমি কী করেছি?

সিং। কী করেছ? তুমি আমাকে কোয়াশ করছ, ইনটিমিডেট করছ, ঘুষ দিতে চাইছ আমাকে।

শিবতোষ। ঘুষ? দু-বেলা খেতে পাই না পেট পুরে, আমি দেব ঘুষ?

সিং। হ্যাঁ ঐ পায়ে পড়াটাই ঘুষ, ক্রিমিনাল ইনটিমিডেশন। মোহ দিয়ে মনটা ভিজিয়ে কাজ বাগানোর চেষ্টা। গলা টিপে ধরাও যা পা চেপে ধরাও তাই। দুটোই অন্যায় ভাবে কাজ আদায়ের ফন্দি।

শিবতোষ। তবে কি আপনার পা না ধরে গলা টিপে ধরব?

সিং। ব্যেরা! ব্যেরা! (ঘন-ঘন কলিংবেল বাজাতে লাগলেন) কেউ কোথাও নেই? রাম সিং! রামহেলন সিং!

ব্যস্ত পায়ে মেঘমালার প্রবেশ। বয়েস উনিশ-কুড়ি

মালা। কী হয়েছে বাবা?

সিং। ব্যেরা কোথায়?

মালা। সিঁড়ির গোড়ায় বসে কাঁদছে।

সিং। কাঁদছে?

মালা। হ্যাঁ, বলছে, চাকরি থেকে সাব ছাড়িয়ে দিয়েছেন খানিক আগে। তাই কলিং বেল বাজলেও ভেতরে ঢুকছে না। বলছে, বিনা চাকরিতে কামরার ভেতরে ঢুকলে সাব তাকে মারবে। মাইনে নেই অথচ মার খাবে এ কড়ারে সে রাজি নয়।

সিং। ভুল হয়েছে। আর খানিকক্ষণ পরে তাকে ছাড়িয়ে দিলেই ঠিক হত। তখন সে ঠিকই বলেছিল ঘাড় ধরে বার করে দিই লোকটাকে। কিন্তু আর সব চাকর-বাকর গেল কোথায়?

মালা। কেউ বাজারে, কেউ রেশনের জিনিস আনতে। কেন, করেছে কী এ লোকটা?

সিং। করেছে কী! আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। এ একরকমের ঘুষ, ইললিগ্যাল গ্র্যাটিফিকেশন। স্পষ্ট ডি-আই কল। •

শিবতোষ। শুনে রাখুন, ঘুষ লোকে হাতে দেয় না, দেয় পায়ে। টাকায় বা জিনিসে নয়, শুধু কাকুতি-মিনতিতে। শিখে রাখুন একবার।

সিং। তারপর পা ছেড়ে দিয়ে বলে কিনা গলা টিপে ধরব!

মালা। কী ভীষণ কথা! তুমি লোকটাকে এতক্ষণ তাড়িয়ে দাওনি কেন?

সিং। না, আমি ওকে পুলিশে দেব। দাঁড়া, আমি ফোন করছি।

মালা। পুলিশ পরে হবে বাবা। আগে আমরা আছি, পরে চাকর-বাকর আছে। শেষকালে পুলিশের কথা ভাবা যাবে। (শিবতোষের দিকে এগিয়ে এসে) কি, আমাদের বাড়ি ছেড়ে এক্ষুনি চলে যাবেন কিনা বলুন।

শিবতোষ। এক্ষুনি চলে যাব। স্বচ্ছন্দে, হাসিমুখে। বাপ বা

পারে নি মেয়ে পারল। বাপ যা পারল না মহাভারত আওড়ে, মেয়ে তা পারল এক কথায়। মেয়েদেরই জয়-জয়কার।

সিং। (সগর্জন) যাও, বেরিয়ে যাও এখুনি।

শিবতোষ। যাচ্ছি, কিন্তু আপনার কথায় নয়। মমতার নির্ঝর এই মেয়েরা, মেয়েদেরই জয়-জয়কার। নমস্কার মেয়েদের। বাপ যা পারবে না, মেয়ে তাই পারবে। এক কথায় পারবে। (প্রস্থান)

মালা। লোকটা কে বাবা?

সিং। আমার অফিসের প্যাকিং ডিপার্টমেণ্টের একটা পেটি কেরানি। মোটে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে।

মালা। কী স্পর্ধা দেখেছ। সেই লোকটা এসেছে বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে!

সিং। আর এমন রোগ্, বিনাকার্ডে ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সাধে কি আর বেয়ারাকে ডিসমিস করি।

মালা। কী চায় ও লোকটা? ব্ল্যাক-মার্কেটের পারমিট?

সিং। না, না, ওসব কিছু নয়। চায় ছুটি। সাত দিনের ছুটি।

মালা। কী আবদার। এখন কল-কারখানায় চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করার কথা, এখন কিনা ছুটি চায়। ছোট কাজ ফাঁকি দিলে কেউ আর বড় কাজ করতে পারে?

সিং। দেখ দিকি, এখন একদিনে আমার ফ্যাক্টরিতে অন্তত এক হাজার টাকা নেট মুনাফা। এমন সময় কাউকে ছুটি দেওয়া চলে?

মালা। কেন, ছুটি চায় কেন?

সিং। বলে কিনা কে এক জেঠার অসুখ।

মালা। জেঠার অসুখ! (সশব্দ হাসি) রাজ্যে আর অসুখ হবার লোক গেল না। নিশ্চয়ই একটা বুড়ো-হাবড়া ভ্যাবা-গঙ্গারাম, ডাবা হুঁকোয় তামাক খায় আর খকখক করে কাশে। (আবার হাসি)

সিং। তা ছাড়া আবার কি।

মালা। তার জন্যে আবার এত মায়া! এত আদিখ্যেতা।

সিং। এই জেঠা-কাকারাই দেশটাকে উচ্ছন্নে দিলে।

মালা। আর এই একটা জরদ্গব জেঠার জন্যে ও তোমার পা চেপে ধরল। লোকটা কী!

সিং। অপদার্থ।

মালা। চাকরিতে সটান ও ইস্তাফা দিতে পারত না?

সিং। আমিও তাই বললাম তাকে তখন। বললাম, আমি হলে চাকরি ছেড়ে দিতাম, মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে নতজানু হতাম না।

মালা। সত্যি, আজকালকার ছেলে হয়ে এই অপমান, এই অবনতি ও স্বীকার করে নিল ভাবতে ভাবণ জ্বালা হচ্ছে।

সিং। নইলে উপায় কি বল? একটা চাকরি গেলে জুটবে কোত্থেকে আরেকটা? তখন জেঠা-খুড়োয় শানাবেনা। পেট যখন চোঁ-চোঁ করবে তখন তার কাছে জেঠার শোকটা সাপের তুলনায় কেঁচো।

মালা। আর লোকটা কী আশ্চর্য ভীরু। যেই বললাম চলে যান, সুড়সুড় করে চলে গেল।

সিং। একেবারে একটা নিনি, স্পাইনলেস।

মালা। ওকে ছুটি না দিয়ে ভাল করেছ বাবা। ওদের ভাল করে ঘা মারা দরকার! নইলে ওরা মানুষ হবে না।

সিং। ছুটি তো দেবই না, উলটে আমার সঙ্গে বেয়াদবি করেছে বলে ওর নামে প্রোসিডিং করব। ডিসিপ্লিনারি স্টেপ নেব ওর বিরুদ্ধে।

মালা। একশোবার নেয়া উচিত। অত্যাচার না হলে আত্মসম্মান ফিরে আসবে না ওদের।

সিং। (দেয়ালে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) এ কি, এগারটা বাজে। আমাকে আজ-অফিস যেতে হবে না? মাই গড। দামি সময় কী

বাজে কাজে কেটে গেল। কোথেকে এক ঠেঁটা এল তার জেঠা নিয়ে, জেঠা বাড়িয়ে দিলে আমার। যাক, অফিসে গিয়ে এর শোধ নেব। তুই আমার টেবিলটা একটু গুছিয়ে দে দিকি, আমি চান করে নিচ্ছি চট করে। (প্রস্থান)

[দু' এক মিনিট পরেই শিবতোষের প্রবেশ। অদ্ভুত চেহারা। খালি পা, চুল উস্কখুস্ক, জামাটা ছেঁড়া, গায়ে ধুলো মাখা]

মালা। (ভয় পেয়ে) কে?

শিবতোষ। আমি।

মালা। কে আপনি?

শিবতোষ। চিনতে পাচ্ছেন না?

মালা। না। পাচ্ছি না।

শিবতোষ। না? না-র আজ স্থান নেই সংসারে। বলুন, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি।

মালা। না পারলেও বলতে হবে?

শিবতোষ। কেন, খানিক আগে দেখেন নি আমাকে এই ঘরে? আপনার বাবার পায়ের সামনে মনুষ্যত্বের নৈবেদ্য দিয়েছিলাম—

মালা। আপনিই সেই?

শিবতোষ। হ্যাঁ, আজ শুধু হ্যাঁ বলতে হবে। আমিই সেই।

মালা। কিন্তু মুহূর্তে আপনার এ কী রকম চেহারা হয়ে গিয়েছে! চুল উসকো-খুসকো, খালি পা, জামাটা ছেঁড়া, গায়ে ধুলো মাখা, এ আপনি কী হয়ে গিয়েছেন।

শিবতোষ। ও! আপনি এতক্ষণ বুঝতে পারেন নি বুঝি? আমি পাগল হয়ে গিয়েছি।

মালা। সে কি?

শিবতোষ। স্রেফ পাগল হয়ে গিয়েছি। আগে শুধু মাথাটা খারাপ হয়েছিল, এখন একেবারে শক্ত ইঁট হয়ে গিয়েছে। আগে ছিল গোবর এখন শুধু জল। ঝুনো নারকেলের মত নাড়েন জলের শব্দ শুনবেন মধ্যে।

মালা। এই বললেন নিরেট ইঁট, আবার তখুনি বলছেন ভিতরে জল!

শিবতোষ। পাগলে কী না বলে! যা জল, পাগলের কাছে তাই মাটি। যা দিন, পাগলের কাছে তাই অন্ধকার। আর যা না, পাগলের কাছে তাই হ্যাঁ, আলবৎ, বাই অল মিন্‌স্।

মালা। সামান্য কটা দিন ছুটি পাননি বলে একেবারে এই দুর্দশা?

শিবতোষ। বাঃ, খাসা, এই তো ঠিক চিনতে পেরেছেন। তখন তবে না বলছিলেন কেন? না, না বলবেন না। বলুন, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। বলুন।

মালা। হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি।

শিবতোষ। বাঃ, তোফা, হ্যাঁ বলেছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলতে হবে আপনাকে।

মালা। হ্যাঁ বলতে হবে?

শিবতোষ। হ্যাঁ, শুধু হ্যাঁ বলতে হবে। যত পারেন, হ্যাঁ বলবেন। যতদিন বাঁচবেন, শুধু হ্যাঁ বলে যাবেন।

মালা। তার মানে?

শিবতোষ। পাগলের কথার আবার মানে কি? হ্যাঁ, আর না, এই নিয়েই সংসার। ইতি আর নেতি। সম্পূর্ণতা আর শূন্যতা। না বলা তো অত্যন্ত সোজা, হ্যাঁ বলাটাই কঠিন। বাঁচবার সাধনা কঠিনের সাধনা। না মানে বঞ্চনা, বিরতি। হ্যাঁ মানেই শক্তি, স্বাধীনতা।

মালা। এ যে বদ্ধ পাগল দেখছি।

শিবতোষ। আর বদ্ধ নয়, মুক্ত পাগল। না-পাগল নয়, হ্যাঁ-পাগল।

সংসারে না-এরই তো ছড়াছড়ি। আপনার নাকের ডগাতেই তো না লেখা। আপনি যে নারী তার মধ্যে না, আপনি যে নাগালের বাইরে তার মধ্যে পর্যন্ত না রয়েছে উদ্ধত হয়ে। আপনি নারাজ আমি নাছোড়। সবতাতেই না। কিন্তু বীরের মত হ্যাঁ বলতে পারছে কজন? আজকে শুধু ছোট্ট করে একটু হ্যাঁ বলুন। কাল যদি না বলেন, বলবেন, তাতে আমি নাকাল হব না, কিন্তু আজকে ছোট্ট করে একটি হ্যাঁ বললেই আমি বেঁচে যাই।

মালা। এ কী প্রলাপ বকছেন আপনি?

শিবতোষ। এতক্ষণ বিলাপ করেছি, এবার প্রলাপের লগ্ন এসে পৌচেছে। আচ্ছা, আপনি কোনোদিন প্রলাপ বকেছেন?

মালা। না। আমি কি পাগল?

শিবতোষ। পাগল হয়ে না হোক, এমনি জ্বরের ঘোরে কিংবা স্বপ্নে কিংবা হঠাৎ কোনো ঝোঁকের মাথায় কোনোদিন প্রলাপ বকেন নি? বিলম্বিত প্রলাপ না হোক সংক্ষিপ্ত প্রলাপ?

মালা। না। আমার জ্বর হয় নি, আমি স্বপ্ন দেখি না, আমার কোনো ঝোঁক নেই।

শিবতোষ। এত না হলে যে নাজেহাল হয়ে যাব, নাস্তানাবুদ। জীবনে কোনোদিন আপনি একটাও বেফাঁস কথা বলেন নি? মানে হয় না, সত্যিকারের মনের কথাও নয়, অথচ একটা মহান কথা, কোনোদিন বলে ফেলেন নি ফস করে? জীবনের অসতর্ক মুহূর্তে একটা অসংলগ্ন কথাও কি মুখ থেকে বেরোয়নি আপনার?

মালা। না।

শিবতোষ। না, না, না। আপনার সব কিছুই না। আপনি হ্যাঁ বলতে শেখেন নি? বলি, হাঁস দেখেছেন? হাঁড়ি দেখেছেন? হাঁসফাঁস করেছেন কোনোদিন?

মালা। তা করেছি হয়তো।

শিবতোষ। যাক, হ্যাঁ পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম। ইচ্ছে করলে আপনি তবে এক-আধটা হ্যাঁও বলতে পারেন।

মালা। পারি বৈকি। যদি কেউ বলে, পাগল দেখেছ কিনা, বলব, হ্যাঁ, দেখেছি। যদি কেউ বলে চুনোপুঁটি বাঙালী কেরানি দেখেছ কিনা, বলব হ্যাঁ, দেখেছি! যদি কেউ বলে, এমন অমানুষ দেখেছ কিনা যে ছুটির জন্যে মনিবের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে, বলব, হ্যাঁ, নিজের চক্ষে বিশ্বাস হয় না, তবু, হ্যাঁ, দেখেছি।

শিবতোষ। চমৎকার। চমৎকার। হ্যাঁটাই একটা বীরত্বের ভাষা। না-টা দুর্বল, নিস্তেজ। কিন্তু হ্যাঁ বলারও একটা রীতি আছে। সব হ্যাঁ-ই আর সমান সুরে সমান ঢঙে উচ্চারিত হয় না। যদি কেউ বলে, আপনি দেশের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত? উত্তরে বলবেন, হ্যাঁ। প্রায় বজ্রের মত। যদি কেউ বলে, আজকে তিনটের ট্রেনে কলকাতা ছাড়বেন? উত্তরে বলবেন, হ্যাঁ। শাদা, সরল, সাধারণ কথা। শুধু একটা ভদ্র অথচ স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা। আর যদি কেউ বলে, বিয়ে করবেন? উত্তরে তখনো বলবেন, হ্যাঁ। কিন্তু একেবারে অন্য রকম সুরে। তাতে মেশানো থাকবে খানিকটা স্বপ্ন, খানিকটা লজ্জা, খানিকটা আবেশ। একেকটা হ্যাঁর একেক রকম ছন্দ, একেক রকম চেহারা। আচ্ছা, আমাকে দেখে আপনার মায়া হয়?

মালা। ঘেন্না হয়।

শিবতোষ। তার মানেই মায়া হয়। যাকে আমরা ঘেন্না করি তাকে একটু প্রচ্ছন্ন মায়াও করি। ঘেয়ো কুকুরকে দেখে ঘেন্না হয় বটে, কিন্তু তাকেও পারলে এঁটোকাঁটা খেতে দিই। আচ্ছা, আমার হয়ে আপনি কিছুই করতে পারেন না?

মালা। আমি কেন করতে যাব? আমার কী মাথাব্যথা? আপনি

ছুটি পাচ্ছেন না, আপনার চাকরি থাকছে না তাতে আমার কী আসে-যায়। আপনি পাগল হয়ে গেলে আমার ঘুমের কি ব্যাঘাত হবে?

শিবতোষ। তবু যদি পারেন, দুর্বলের, দরিদ্রের, নির্যাতিতের পক্ষ নেবেন না আপনি?

মালা। আমি কী করতে পারি! কীই বা আমার ক্ষমতা আছে। যেখানে পায়ে ধরেও আপনি কিছু করতে পারেন নি, সেখানে আমার কী করবার থাকতে পারে!

শিবতোষ। আপনি কিছুই করবেন না। নড়বেনও না এক চুল। শুধু আপনার বাবাকে সংক্ষেপে একটি হ্যাঁ বলবেন।

মালা। সংক্ষেপেই বলি আর বিস্তারিতভাবেই বলি, বাবা আমার কথা শুনবেন না। আমি চাই তিনি না শোনেন। আমি চাই তিনি নিশ্চল নিষ্ঠুর থাকুন। আমি চাই তিনি থাকুন এমনি অবিবেচক প্রভু, অত্যাচারী শাসক। আমি আমার বাবার পক্ষে। একটা পাগল, একটা অমানুষ বা অর্ধ-মানুষের জন্য তাঁকে আমি বলতে যাব কেন?

শিবতোষ। আহাহা, কোনো কিছুই আপনাকে বলতে হবেনা, সম্পূর্ণ একটি বাক্য পর্যন্ত নয়। একটি শুধু হ্যাঁ বলবেন। এটাকে বলা বলে না, শুধু ঠিকমত সুর বজায় রেখে একটা শব্দ করা। মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ করতে পারবেন না?

মালা। আপনি পারবেন? আপনি পারবেন হ্যাঁ বলতে?

শিবতোষ। আমি?

মালা। হ্যাঁ, আপনি। আপনি যে এত হ্যাঁর ভক্ত, আপনার মুখ দিয়ে বেরুবে ও-শব্দটি? জয়ীর মত বীরের মত যোদ্ধার মত পারবেন আপনি হ্যাঁ বলতে?

শিবতোষ। হা-হা! হ্যাঁ বলতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব।

মালা। পারবেন? যদি বলি, চাকরি ছেড়ে দিতে পারবেন?

শিবতোষ। চাকরি?

মালা। কি, হ্যাঁ বলুন। মুখ যে শুকিয়ে গেল! পাগলামি যে কেটে গেল এক পলকে। কি, বলুন, হ্যা, ছেড়ে দেব চাকরি। যে চাকরিতে আত্মীয়ের মরণাপন্ন অসুখে ন্যায্য ছুটি পাওয়া যায় না, কর্মচারীর সুখদুঃখের চাইতে প্রভুর স্বার্থই যেখানে বড হয়ে ওঠে, যে চাকরিতে অধিকারটাই মনে হয় অনুগ্রহ আর সে-অনুগ্রহ আদায় করতে মনিবের পায়ে পড়তে হয়, পাগল সাজতে হয়, বলুন, হ্যাঁ, সে চাকরি ছেড়ে দেব। মেরুদণ্ড খাড়া করে উঠে দাঁড়াব মাটির উপর। বলুন, দেখি কেমন আপনার বুকের পাটা। অন্যের বলার আগে নিজে বলুন। নিজে বলে প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান।

শিবতোষ। কিন্তু আমার বলবার পর আপনিও হ্যাঁ বলবেন?

মালা। বলব। আপনি যদি এই নোংরা, নীচ চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারেন, যদি আত্মসম্মানে জ্বলে উঠতে পারেন আগুনের মত, তবে, হ্যাঁ, আমি চলে আসব আপনার পক্ষে। তখন বলব না হয় একটা হ্যাঁ, একটা কেন, অনেকগুলি। তখন জোর করে বাবাকে বলব, হ্যাঁ, একে আর তুমি চাকরিতে আটকে রাখতে পার না, এর এখন লম্বা ছুটি মিলে গেছে। পাপের বন্ধনের পর মুক্তি মিলেছে এতদিনে।

শিবতোষ। চমৎকার বলবেন, খাসা বলবেন। দোহাই আপনার। কথা-টথা আপনাকে কিছুই বলতে হবে না ব্যাখ্যা করে, বক্তৃতা ফাঁদতে হবে না, শুধু দয়া করে আলগোছে একটি হ্যাঁ বলবেন।

মালা। বলব। কিন্তু আগে আপনি বলুন।

শিবতোষ। আমি বলব বজ্রের মত, আপনি বলবেন গদ্গদের মত।

মালা। বজ্র বুঝি এখন মাথায় এসে পড়ছে, গলায় আর আওয়াজ ফুটছে না।

শিবতোষ। (উল্লসিত) হ্যাঁ, চাকরি ছাড়ব। এখুনি ছাড়ব, এই

মুহূর্তে। ছাড়ব কি ছেড়েছি। ছেড়ে দিয়েছি চাকরি। এই দেখুন পকেটে করে নিয়ে এসেছি ইস্তফাপত্র, লেটার অফ রেজিগনেশন। (পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে পড়তে দিল মালাকে)

মালা। একস্‌লেণ্ট। এই তো মানুষের মত ব্যবহার। সাহস আর বীর্য থাকলে পুরুষের চাকরি জোগাড় করে নিতে কতক্ষণ! নিজেও বাঁচলেন, সমস্ত দেশের যৌবনেরও মান রাখলেন। যাই বাবাকে ডেকে আনি গে।

শিবতোষ। হ্যাঁ, ডেকে নিয়ে আসুন। না বলব না কখনো। আজকে আর না নেই অভিধানে। এখন চাকরি ছেড়ে দেবার পর মিস্টার সিংও আর না বলতে পারবেন না। (মালার প্রস্থান)

[অফিসের বেশে মিস্টার সিং-এর প্রবেশ]

সিং। এ কি! তুমি আবার এসেছ?

শিবতোষ। শুধু আসিনি। আপনার এই সোফাটির উপরে বেশ চেপে বসেছি। চেহারাটা দেখে আমাকে পাগল ভাববেন না যেন। সামান্য ক'টা দিনের ছুটি না পেলে আমরা অমন পাগল হই না। কোনো অসুখও কিন্তু আমার নেই। মাথাটি একটু খারাপ হয়েছিল, তা এখন দিব্যি সেরে গেছে। আমি এমনি একজন সাধারণ ভদ্রলোক, জেণ্টেলম্যান য়্যাট লার্জ। আপনার বাড়িতে সম্মানিত অতিথি। বসুন।

সিং। হোয়াট ডু ইউ মিন?

শিবতোষ। ফুটছে না, কণ্ঠে আর সেই স্বর ফুটছে না, জাঁহাপনা। দিন না, আপনার দেশালাইটা দিন না দয়া করে। একটা সিগারেট ধরাই।

সিং। এমন বেয়াদব! দিস ইনসাবর্ডিনেশ্যন!

শিবতোষ। দেশলাই আমার কাছেই হয়ত আছে। (সিগারেট

ধরিয়ে) আঃ, আপনার সামনে বসে সিগারেট খাব এ স্বর্গসুখ কে ভাবতে পেরেছিল। কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন—

সিং। এর পরিণাম কি জান?

শিবতোষ। বিলক্ষণ জানি। পরিণাম পকেটে করেই নিয়ে এসেছি। (পকেট থেকে কাগজ বের করে) এই নিন আমার লেটার অফ রেজিগনেশন।

সিং। (পড়ে নিয়ে) তুমি চাকরি ছেড়ে দিলে!

শিবতোষ। হ্যাঁ, ছেড়ে দিলাম। এখন নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছি আমি। না-এর থেকে চলে এসেছি হ্যাঁ-যে। ফ্রম নেগেশন টু য়্যাফারমেশান। ভয় আর ভাবনা থেকে শক্তি আর স্বাধীনতায়। মিনতি থেকে দাবিতে। আহা, আপনার কি দুঃখ! কেউ আর আপনার ধমক খাবে না, আপনার তাঁবেদারি করবে না, আপনার পা চেপে ধরবে না। আহা, আপনার সব জেল্লা ধুয়ে গেল। কি কষ্ট! আমি আজ আর চাকর নয়, এমনি একজন ভদ্রলোক, আপনার বাড়িতে অতিথি, আপনার বাইরের ঘরে বসে সিগারেট খাচ্ছি।

সিং। তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছ শিবতোষ। (চেয়ারে বসলেন)

শিবতোষ। হা-হা! পাগল হয়ে গিয়েছি! এরকম সুস্থ আর প্রকৃতিস্থ আমি এর আগে কখনো অনুভব করিনি। যখন আমি আপনার পা ধরেছিলাম তখনই পাগল হয়েছিলাম, এখন একেবারে শান্ত, স্বচ্ছন্দ, সুন্দর হয়ে গিয়েছি। চাকর থেকে হয়েছি এখন ভদ্রলোক, মুক্তপুরুষ। আমাকে এখন আর আপনার 'তুমি' ও 'শিবতোষ' বলার অধিকার আছে কিনা ভাববার বিষয়।

সিং। বেশ, তোমার রেজিগেশান আমি য়্যাকসেপ্ট্ করলাম। হ্যাঁ, তুমি এখন যেতে পার।

শিবতোষ। জানি, আপনাকেও হ্যাঁ বলতে হবে। আর, 'তুমি'

যদি বলতে চান, বলুন। অনেকদিনের আলাপ। স্নেহ তো না করেন এমন নয়।

সিং। দেখ, তোমার আর অফিস নেই, বেঁচে গেছ। কিন্তু আমার অফিস আছে। আমাকে বেরুতে হবে এখুনি।

শিবতোষ। কেউ আপনাকে বাধা দিচ্ছে না। আমাকেও বেরুতে হবে তিনটের ট্রেনে। একেবারে কিছুই সাজগোজ, গোছ্‌গাছ না করে বেরুনো সম্ভব হয় কি করে?

সিং। হোয়াট ডু ইউ সে?

শিবতোষ। গলা যেন আরও বসে গেছে মনে হচ্ছে। তেমন আর জমকে উঠছে না।

সিং। তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কিনা বলো।

শিবতোষ। আর আমাকে আপনি ধমকাতে পারেন না। আপনি আর আমার মুনিব নন। তবু যদি ধমকান সেটি আপনার অসভ্যতা হবে। শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে মার্জিত ভাষায় আলাপ করুন।

সিং। আলাপ করতে হয়, সন্ধের পর আসবে, এখন অফিস-টাইমে কেউ আলাপ করে না।

শিবতোষ। কিন্তু সন্ধের আগেই যে আমাদের ট্রেন। বেশ, যখন বলছেন, তখন এখুনিই যাবো। বেশ, টাকা দিন। চেক নয়, নগদ টাকা। ব্যাঙ্কে যাবার সময় নেই।

সিং। টাকা! টাকা কিসের?

শিবতোষ। বা, এত দূরের রাস্তা, যেতে টাকা লাগবে না?

সিং। টাকা লাগবে তো তার আমি কী জানি! তুমি বিনা নোটিশে কাজে ইস্তফা দিয়েছ, তোমার মাইনে বাবদ কিছু পাওনা হতে পারে না।

শিবতোষ। আমার আবার মাইনে!

সিং। তবে টাকা দেব কেন?

শিবতোষ। এমনি দেবেন। দুজনে যাব শিলং, হোটেলে থাকব দিন সাতেক। খরচ তো আর চারটিখানি নয়।

সিং। দুজনে যাবে! শিলং। তার মানে? আরেকজন কে?

শিবতোষ। আর কে! যার জন্যে এক কথায় চাকরি ছেড়ে দিলাম। কবরের থেকে বেরিয়ে এলাম জ্যান্ত মানুষ। মোমের মেরুদণ্ড খুলে নিয়ে যে লোহার মেরুদণ্ড পরিয়ে দিল। আপনার মেয়ে। মেঘমালা।

সিং। আমার মেয়ে? হোয়াট ডু ইউ মিন? আমার মেয়ে তোমার সঙ্গে শিলং যাবে? এক গাড়িতে? এক হোটেলে থাকবে তোমরা একসঙ্গে?

শিবতোষ। হ্যাঁ, সাহেবি হোটেলে। আমাকে বিশ্বাস না হয় আপনার মেয়েকে ডেকে জিগগেস করুন।

সিং। তুমি কি বলতে চাচ্ছ, শিবতোষ?

শিবতোষ। এখন ভদ্রলোক বনে গিয়েছি বলে ব্যাপারটা ভদ্রভাবেই বোঝাতে চাচ্ছি।

সিং। ভদ্রভাবে! তুমি আমার মেয়েকে এলোপ করে নিয়ে যাচ্ছ?

শিবতোষ। স্পষ্ট দিনের আলোয় সদর দরজা দিয়ে চলে যাচ্ছি দুজনে, আপনাকে আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে, এর মধ্যে এলোপমেণ্টের আছে কি? চুক্তিতে আবদ্ধ আমরা দুজনে, সত্যের কাছে শপথ নিয়েছি, এর মধ্যে ভয়েরও কিছু নেই, লুকোবারও কিছু নেই।

সিং। তোমরা দুজনে বিয়ে করবে?

শিবতোষ। দুই আর দুইয়ে চারই হয়, পাঁচ হয় না।

সিং। দাঁড়াও, ডাকছি আমি মালাকে! কিন্তু যদি সে না বলে তোমাকে আমি হাজতে পুরব।

শিবতোষ। মাটির তলায় পুঁতবেন। আপনার মেয়েকে আপনি চেনেন নি। আমি চিনেছি। সে দেবীর দেশের মেয়ে, মুক্তির দেশের মেয়ে। যৌবনের সে মান রাখবে। সে হ্যাঁ বলবে। সে তার শপথ ভাঙবে না। যাকে সে মানুষ করেছে তাকে আবার সে পুতুল বানাবে না। হ্যাঁ, ডাকুন তাকে।

সিং। মালা! মালা! মেঘমালা!

(মেঘমালার প্রবেশ)

মালা। ডাকছ বাবা?

সিং। তুই এই লোকটাকে চিনিস?

মালা। হ্যাঁ—

সিং। এই নোংরা, খালি-পা, পায়ে ধূলোমাখা লোকটাকে তুই ভালবাসিস?

মালা। হ্যাঁ—

সিং। এর সঙ্গে একা তুই আজ শিলং যেতে প্রস্তুত?

মালা। হ্যাঁ—(দ্রুত প্রস্থান)

[মিস্টার সিং টেবিলের উপর দুই হাতের বিরাট শব্দ করে মাথা গুঁজে পড়ে রইলেন খানিকক্ষণ। পরে]

সিং। (আচ্ছন্ন গলায়) শিবতোষ।

শিবতোষ। বলুন।

সিং। এ তো হয় না।

শিবতোষ। কী হয় না!

সিং। না, এ হয় না কিছুতেই। তোমার চাকরি তো ইস্তফা দেয়া হয় না। তোমার ইস্তফার দরখাস্ত আমাকে ছিঁড়ে ফেলতে হচ্ছে। (ছিঁড়ে ফেললেন)

শিবতোষ। মোটে একটা পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি। ও থাকলেও যা না থাকলেও তাই।

সিং। না। তুমি জান না। আমাদের অর্গানাইজিং ডিপার্টমেণ্টে একটা আড়াই শো টাকা মাইনের চাকরি খালি আছে। ওটার জন্যে বিজ্ঞাপন দিই নি। নিকটতম কোনো আত্মীয়কে সেটা দেব তাই ভেবে রেখেছিলাম। তোমার চেয়ে নিকটতম আত্মীয় আজ আর আমার কে আছে। তোমার প্রমোশন না হবে তো হবে কার। পরে আরো কত হবে ঠিক কি।

শিবতোষ। কিন্তু প্রমোশনের চেয়েও আমার আরেকটা বড় জিনিস ছিল।

সিং। কি?

শিবতোষ। ছুটি। পনেরো দিনের ছুটি।

সিং। নিশ্চয়ই। এখুনি হয়ে গেছে ছুটি। পূজনীয় গুরুজন জেঠামশাই, তাঁর ঘোরতর অসুখে যাবে বই কি, একশোবার যাবে।

শিবতোষ। অর্ডারটা লিখে দিন কাগজে।

সিং। হ্যাঁ, তুমি এখন বাড়ির ছেলে, তোমার জন্যে আবার রিটন অর্ডার! আমার মুখের কথাতেই তোমার সাত খুন মাপ।

শিবতোষ। তবু আফিসের ডিসিপ্লিনটা মানা উচিত। নিজের দোকান থেকে জিনিস কিনব, দাম দেব না, এ হতে পারে না।

সিং। যখন বলছ, লিখে দিচ্ছি অর্ডার। পনেরো দিন? না, একুশ দিন করব? যাক গে, ইচ্ছে করলে ওভার-স্টে করো। মোট কথা, জেঠামশাইকে ভালো না করে এসো না। (শিবতোষের পিঠ চাপড়ে) আমি জানতাম তোমার উন্নতি হবে। তোমার অর্গ্যানিজেশনের ক্ষমতা প্রচণ্ড। দেখ না, কোথায় তোমাকে তুলে দি।

(মেঘমালার প্রবেশ)

মেঘমালা। এ কি, আবার আপনি চাকরি নিলেন ?

সিং। বা, বেশ বুদ্ধি দিচ্ছিস। সাধে কি আর বলেছে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী! বলি, চাকরি না নেবে তো খাবে কি? খাওয়াবে কি? আর এখন এ পঁয়তাল্লিশ টাকার চাকরি নয়, আড়াই শো টাকার চাকরি। তার পর বাড়বে, ক্রমশ বাড়বে। প্রমোশন, প্রমোশন।

মেঘমালা। এই কথা ছিল আপনার সঙ্গে ?

সিং। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিলং হবে'খন ক'দিন বাদে। আগে ও ওর জেঠামশাইকে দেখে আসুক। কঠিন অসুখ ওর জেঠামশায়ের, আগে তাঁকে ভাল করুক চিকিৎসা করে। এমন আপনার জন কি তার হবে? তোর শিলং উড়ে যাচ্ছে না।

মেঘমালা। এই আপনার মনুষ্যত্বে প্রমোশন ?

শিবতোষ। মার্জনা করবেন, মালাদেবী। আমার কোনো প্রমোশন নেই। না মনুষ্যত্বে, না বা মেঘলোকে। কাল দেখবেন, কিংবা এখুনি আমি চলে যাবার পর দেখবেন, আমি সেই পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের সেই নগণ্য কেরানিই হয়ে আছি। দাঁড়িয়ে আছি সেই ফাটল-ধরা ভূমিকম্পের মাটির উপর। আমাকে ছুটি পাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাই আপনার দয়ায় ছুটিটাই একটু আদায় করে নিলাম। আর কিছু নয়। ছুটি! ছুটি! শুদ্ধ করে বলতে গেলে, বিদায়! হে বন্ধু বিদায়! (প্রস্থান)

সিং। এ ব্যাপার কি, মালা ?

মালা। কিছু নয়। সব পাগলের কাণ্ড। হ্যাঁ, ছোঁয়াচ কেটে গিয়েছে। তুমি এখন আফিস যাও, বাবা।

যবনিকা

অনধিকার

পাত্র-পাত্রী

যতীশ	....	সিনেমা ডিরেক্টর
জগন্নাথ	....	সাহিত্যিক
শচীন	....	উমেদার
শোভা	....	যতীশের স্ত্রী
হিমানী	....	অভিনেত্রী

১৯৩৮ সাল। কলকাতা। গ্রীষ্মকাল। বিকেল পাঁচটা বেজে দশ মিনিট। দোতলা বাড়ির নিচের তলার ড্রয়িংরুম। দস্তুরমতো সোফা কৌচ টিপয় য়্যাশ-ট্রে। কোণে রেডিয়ো। যেমনটি হয় আজকাল।

দরজা ডাইনে—বাইরে যাবার বা বাইরে থেকে ভিতরে আসবার। মাঝখানে খানিকটা বারান্দা পেরুতে হয়, সেটা দেখা যায় না ঘর থেকে। বাড়ির ভিতরে যাবার দরজাটা বাঁয়ে উত্তরের কোণ ঘেঁসে। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি খানিকটা চোখে পড়ে।

যবনিকা উঠতে দেখা গেল শোভা একটা সোফায় আধখানা শুয়ে রেডিয়োর বইয়ের পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছে। ভাবখানা শুনি কি না-শুনি। বয়েস সাতাশ-আটাশ, ছিপছিপে গড়ন, সাজাগোজা। রুচিটা একটু খরধার বা উচ্চকণ্ঠ।

সবলে ডাইনের দরজা ঠেলে ঢুকলো জগন্নাথ। বয়স প্রায় চল্লিশ, চোখে চশমা, যত না সজাগ চেহারা তার চেয়ে দেখাবার চেষ্টাটা বেশি। যেন অনেক ভরাডুবির থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে নিজেকে এমনি একটা ধূর্ত আত্মবিশ্বাস জ্বলছে চোখে। বুচবুচে কালো, শুকনো চেহারা, গোঁফের রেখায় অনেক ধৈর্য আর একাগ্রতার পরিচয়।

জগন্নাথ। (হাতের খাতাটা সজোরে সামনের নিচু টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে) এ অসম্ভব।

শোভা। (দীর্ঘস্বরে) ও! আপনি! আমি চমকে গিয়েছিলুম।

জগন্নাথ। (সামনের সোফায় বসে পড়ে) চমকে ওঠবারই কথা। এ অসহ্য। নিদারুণ অসহ্য।

শোভা। (হেসে) রোদ্দুরে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছেন বুঝি রাস্তায়? পাখাটা একটু জোর করে দেব?

জগন্নাথ। না। দাঁড়ান। (সুইচ-বোর্ডের কাছে উঠে গেল। গিয়েই সুইচ টিপলো একটা। তাতে আলো জ্বলে উঠলো। আরো একটা টিপলো। সেটাতেও আলো। তিনবারের বার পাখার সুইচ পেয়ে বন্ধ করে দিলে পাখাটা।)

শোভা। ওকি! পাখাটা বন্ধ করে দিলেন যে।

জগন্নাথ। দাঁড়ান, সিগরেট ধরাই। (পকেট হাতড়ে কেস ও

দেয়াশলাই বের করে সিগারেট ধরালো) পাখা চললে কিছুতেই ধরাতে পারি না সিগরেট। যা পারি না তা স্বীকার করতে আমার কখনো লজ্জা করে না।

শোভা। একমাত্র গল্প লেখা ছাড়া।

জগন্নাথ। কী বললেন ? গল্প লিখতে পারি না আমি ?

শোভা। অন্তত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের তাই তো মত।

জগন্নাথ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ? ডক্টর পত্রনবীশকে আপনি বুদ্ধিমান বলতে চান ?

শোভা। সে আবার কে ?

জগন্নাথ। সে একটি অপোগণ্ড প্রোফেসর। বিশ্বের জগঝম্প কিন্তু বোকার প্রধান। তার ওখান থেকেই তো এখন আসছি।

শোভা। কেন, করেছে কী সে ?

জগন্নাথ। সেই বিজ্ঞাপন দেখেননি কাগজে, ছোটগল্পের একটা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন। যারটা প্রথম হবে সে পাবে মবলগ তিন শো টাকা। একটা উপন্যাস লিখে যা পাওয়া যায় না বাঙলা দেশে। দস্তুরমতো লোভনীয় ? কী বলেন ?

শোভা। ওমা, আপনি পাঠিয়েছেন নাকি সেখানে গল্প ?

জগন্নাথ। তার মানে ? আমি পাঠাবো না তো কে পাঠাবে ? কার আছে আর সেই প্রথম হবার অধিকার ?

শোভা। ওমা, আমি জানতুম, ও-সব প্রতিযোগিতায় লেসার আর্টিস্ট বা নিরেস লেখকরাই যোগ দেয়। যারা ভালো লেখে তাদের অন্তত একটা অভিমান থাকে পাছে তাদের লেখার দাম ঠিক ধরা না পড়ে। তাই তারা এ-সব হাটের ভিড়ে ঘেঁসতে চায় না। দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে।

জগন্নাথ। তারা ভীরু, অথর্ব। তাদের অভিমানই আছে, অসার

অহংকার, কিন্তু অধিকার নেই কাণাকড়ির। অধিকার আমার। আমিই আজ অগ্রগণ্য। এ-কথা উচ্চকণ্ঠে রাষ্ট্র করবার দিন এসেছে আজ। আর কেউ না করে, আমাকেই করতে হবে। নির্লজ্জ মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যের লক্ষণই হচ্ছে নির্লজ্জতা।

শোভা। ও! পাখাটা আর খোলেননি তারপর। (লাফিয়ে উঠে পাখাটা খুলে দিল।)

জগন্নাথ। ডাকুন না আপনার সে সব খ্যাতিমান সাহিত্যবীরদের। একটা সম্মুখীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক আমার সঙ্গে। দেখি কে টেঁকে কে বা ফেঁসে যায়।

শোভা। কিন্তু বিচার করবে কে?

জগন্নাথ। সেই হচ্ছে কথা। বিচার করবে কিনা রুদ্ধবুদ্ধি যত অধ্যাপক। পত্রকীট পত্রনবীশের দল। যাকে ওঁরা ফতোয়া দেবেন তারই হবে ফতে, আর সব ফৌত—চলবে না এই ফেরেববাজি।

শোভা। আপনি ঐ পত্রনবীশের খপ্পরে পড়লেন কী করে?

জগন্নাথ। আর বলেন কেন, গল্পনির্বাচনসমিতির সেই মোড়ল।

শোভা। আপনার গল্পটা তা হলে নির্বাচন করেন নি তিনি? তাঁর অকাপট্যে শ্রদ্ধা আমার সত্যি বেড়ে যাচ্ছে, জগন্নাথবাবু।

জগন্নাথ। শুধু নির্বাচন করেন নি নয়, দস্তুরমতো আমাকে তিনি অপমান করেছেন।

শোভা। বলেন কী?

জগন্নাথ। হ্যাঁ, প্রথম করেছেন তিনি কোন কুমারী কাদম্বিনী গুহকে। ভাবুন একবার!

শোভা। একটু যেন নাট্যের আভাস পাচ্ছি। যেখানেই আপনি যান, আশ্চর্য, সেখানেই ঘটনাটা বেশ ঘোরালো করে তোলেন।

জগন্নাথ। সেটা ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা। কিন্তু কাদম্বিনীর দম্ভ আমি

সইতে পারবো না কিছুতেই। বললুম পত্রনবীশকে, প্রমাণ করুন কিসে কাদম্বিনীরটা প্রথম আর আমারটা নবম। তিনি পড়ে শোনালেন কাদম্বিনীর গল্প। বুঝতে পারেন, আগাগোড়া কান্না আর কচাল। চেঁচিয়ে, তর্ক করে, ভয় দেখিয়ে কিছুতেই পত্রনবীশকে দলে আনা গেল না। অনুনয়েও সে অটল। অসহ্য!

শোভা। তা হলে কী হবে!

জগন্নাথ। বলে যা পারিনি তা ছোবলে সারবো আমি। আমি পুষ্পনবীশের দ্বারস্থ হবো।

শোভা। পুষ্পনবীশ!

জগন্নাথ। হ্যাঁ, পত্রনবীশের স্ত্রীর নাম পুষ্পরেণু। চিনতুম তাকে তার বিয়ের আগে। এক নজরেই ঝালিয়ে নিতে পারবো সে ফুটো পরিচয়। আজ তার বৈঠকখানা পর্যন্ত গেছি, কালই সটান রান্নাঘর। দেখি একবার তখন কাদম্বিনীর কাণ্ডটা। সিধে আঙুলে তো ঘি উঠবে না।

শোভা। (ব্যস্ত) দাঁড়ান, তার আগে দরজাটা বন্ধ করি। (ডাইনের দরজায় ছিটকিনি লাগালো)

জগন্নাথ। (ঈষৎ মূঢ়) দরজা বন্ধ কেন?

শোভা। কে কখন এসে পড়ে ঠিক কী! এমন একটা রোমাঞ্চ-সিরিজের প্লট ফেঁদেছেন, দরকার কী, কেউ আচম্বিতে শুনে ফেলে। যা কিছু ষড়যন্ত্র, তা শুধু এখন আমাতে-আপনাতে। (বসলো) বসুন।

জগন্নাথ। স্টুডিয়ো থেকে যতীশবাবুর তো এখনো বাড়ি ফেরবার সময় হয়নি। (বসলো)

শোভা। হয়নি তা বলি কী করে? আজকাল ওঁর কোনো সময়-অসময় নেই। যখন-তখন বাড়ি ফেরেন।

জগন্নাথ। হঠাৎ?

শোভা। নতুন খেয়াল হয়েছে। চোরের মতো আসেন চুপি-চুপি। এদিক-ওদিক একটু উঁকিঝুঁকি মারেন।

জগন্নাথ। তার অর্থ?

শোভা। ষড়যন্ত্র যেমন আছে তেমনি আবার গুপ্তচরও তো আছে। আর কিছু না, হয়তো দেখতে চান, কী করছি আমি, শুয়ে আছি না বসে, কোথায় আছি আমি, একা না একাধিক। হয়তো ভাবেন, চমকে দেবেন একদিন।

জগন্নাথ। হুঁ! ঠিক! ঠিক এমনি সন্দিগ্ধ স্বামী নিয়েই আমার ঐ গল্পটা লেখা। (উঠে টেবিলের উপর থেকে খাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে) পড়ে দেখবেন আপনি। সেই বন্ধু—বন্দুক—পুনর্মিলন। সিনেমার খুব পসিবিলিটি আছে। চতুষ্কোণ গল্প!

শোভা। দেবেন না বইটা আপনার বন্ধুকে।

জগন্নাথ। যতীশবাবুও ঐ পত্রনবীশের দলে। বলেন, আমার গল্পে নাকি হাত নেই। মাথাও নেই। আছে কেবল গলা।

শোভা। কিন্তু ভয় কী! পত্রনবীশই শেষ নয়। আছে পুষ্পনবীশ।

জগন্নাথ। সেই আমার আশ্বাস, মিসেস সেন। কিন্তু আমি ভাবছি, এখুনি যদি ফেরেন যতীশবাবু!

শোভা। দৃকপাত না করে দরজা খুলে দেব। দেখবেন চোখ মেলে। দেখবেন যতদূর ওঁর খুশি।

জগন্নাথ। সাধু! ঠিক এমনি আমার গল্পের নায়িকা। এমনি তার তেজের উদ্ধতি।

শোভা। কে বলে তবে সিনেমায় চলবে না এ-গল্প?

জগন্নাথ। তা হলে চলুন আপনার দোতলার ঘরে, আপনি বিশ্রাম করবেন, আর আমি পড়ে শোনাবো গল্পটা। কিন্তু আপনি যদি পড়েন

আর আমি শুনি বিশ্রাম করতে-করতে—অন্যের গলায় কত দিন শুনিনি নিজের গল্প পড়া !

শোভা। বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘর না হয়েই একেবারে দোতলায় ? টেকনিক হঠাৎ বদলে গেল কেন ?

(বন্ধ দরজায় মৃদু শব্দ)

জগন্নাথ। (সামান্য ত্রস্ত) এ কি, যতীশবাবু নাকি ?

শোভা। কড়া-নাড়া শুনে তো মনে হয় না।

জগন্নাথ। কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত, ভাবুক ধরনের। তাই নয় ? কখনই এ বলবানের ভাষা নয় ! নিজেকে ঘোষণা করবার মতো সাহস নেই এর। কেমন যেন একটু—ভঙ্গুর।

শোভা। দাঁড়ান, দেখি।

(ডাইনের দরজা খুলে দিল। বাঁ হাতে সুজনি-জড়ানো বালিশ ও ডান হাতে সুটকেশ নিয়ে ঢুকলো একটি চারুদর্শন যুবক, বয়েস তেইশ চব্বিশ। পরনের কাপড়চোপড় ময়লা, চুল উসকোখুসকো।

শোভা। (বিস্মিত) এ কি ! তুমি ?

শচীন। (দুহাতের জিনিস মেঝের উপর সশব্দে ফেলে) অসম্ভব। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম।

শোভা। বলো কি ? সাত দিনেই ? আর, পুরীর মতো জায়গা। যেখানে অমন সমুদ্র !

শচীন। আজ্ঞে, হ্যাঁ। ছুটির সমুদ্র আর চাকরির সমুদ্রে ঢের তফাৎ। সাত দিনেই বিস্বাদ হয়ে গেল।

জগন্নাথ। চাকরিটি কী ? বেতন কত ?

শোভা। মন্দ কী আজকালকার দিনে। শ দেড়েক মাইনে।

শচীন। ভীষণ একা লাগতো, শোভা-দি। সমুদ্রের চেয়েও একা।

তুমি যদি সঙ্গে থাকতে, কিছু ভাবতুম না। চুটিয়ে চাকরি করে যেতুম। সাতটি দিন সাতটি সুর হয়ে উঠতো। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম—

শোভা। আর বোলো না। পঞ্চম দিনে আমার সঙ্গেও তোমার বিবাদ হয়ে উঠতো। ধৈবতে না পৌছুতেই ধাবমান হতে। তুমি এমনি ছন্নছাড়া। (দরজা ভেজিয়ে দিল)

শচীন। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া থাকতুম না। সমুদ্র যেত মরে, কিন্তু লক্ষ্মী থাকতো আমার চোখের সমুখে। সত্যি শোভা-দি, তুমি জানো না, তুমি সমুদ্রের চেয়েও সুন্দর, সমুদ্রের চেয়েও আশ্চর্য।

জগন্নাথ। আমি যা আন্দাজ করেছিলুম।

শোভা। হ্যাঁ, বড্ড বেশি কবি-কবি তুমি।

শচীন। উপায় নেই। সত্যিকার মনের কথাটা সুন্দর করে বলতে গেলেই অমনি বিপদ ঘটে। মনের কথাটা বলবো না বা বলতে গেলে কাঠখোট্টা করে বলবো তুমি যে মোটেই তেমনটি নও, শোভা-দি।

শোভা। নই তো নই, কিন্তু এখন করবে কী শুনি? খাবে কী?

শচীন। যা দেবে তাই খাবো। সারা দিন আজ অভুক্ত—ট্রেন আজ ভীষণ লেট।

শোভা। তা দিচ্ছি চলো, কিন্তু কাল খাবে কী? পরশু? তার পরের দিন? চাকরিটি তো খুইয়ে এলে।

শচীন। নিজেকে তো খুইয়ে আসিনি। তবে আর কি! চাকরি না জোটে না জুটবে, আমার যা লাইন, তাই করবো।

শোভা। সে আবার কী?

শচীন। অভিনয়। সিনেমায় প্লে। অবাক হচ্ছ কি? এমন সুশ্রী মুখ, এমন ধারালো চেহারা, আছে তোমাদের বাঙলা দেশে?

শোভা। এখনো মাথায় তোমার ঘুরছে সেই সিনেমার স্বপ্ন?

ঠেলেঠুলে পাঠালুম তোমাকে চাকরি করতে, আর তুমি চাকরি ফেলে ফের এলে সেই সিনেমার আঁস্তাকুড়ে ?

শচীন। এ-স্বপ্ন যে আমি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না, শোভা-দি। আমি আর তুমি এক বইয়ে প্লে' করবো—আমি হিরো আর তুমি হিরোয়িন।

জগন্নাথ। (হঠাৎ) আর বইটা কার ?

শোভা। বইটা আপনার, সন্দেহ কী! জানো, (শচীনকে) জগন্নাথবাবু চমৎকার একটা গল্প লিখেছেন। (খাতাটা জগন্নাথের হাত থেকে টেনে নিয়ে) সন্দিগ্ধ স্বামী, জোচ্চোর বন্ধু, আর হস্তীমূর্খ প্রেমিক। পড়ে শোনাবেন গল্পটা ! ও ! তোমাদের আলাপ নেই বুঝি।

শচীন। মুখ-চেনাচিনি আছে।

শোভা। ইনি জগন্নাথ ভটচাজ, বাংলার উড্ডীয়মান সাহিত্যিক—আর ইনি—

শচীন। ও। আপনিও পুরী থেকে এসেছেন। নমস্কার।

জগন্নাথ। পুরী থেকে !

শচীন। হ্যাঁ, আপনার নামেই সেটা প্রকাশ। তা যাই বলুন, গল্প-টল্প পড়বার বা শোনবার মতো আমার ধৈর্য নেই। একটা পার্ট-টার্ট দিন, প্লে করে দি। আপনি ভাবতেও পারবেন না, কী সব সম্ভাবনা ছিল আপনার চরিত্রে।

শোভা। কোন পার্টটা করবে শুনি ?

শচীন। স্ত্রীটি কেমন আগে তা জানা দরকার। তা যাই হোক, যানজের যখন স্ত্রী নয়, প্রেমিকের পার্টেই নিশ্চয় আরাম পাবো। বুঝলে শোভা-দি, 'পরদা-র আড়ালেতে থাকে পরদার। কোষে অসি ঢাকা বলে এত খরধার।' তাই হস্তিমূর্খই বলো বা গণ্ডারচর্মই বলো, কোনো কিছুতে আমার আঁপত্তি নেই।

জগন্নাথ। আপনাকে মানাবে না আমার গল্পের সেই প্রেমিকের পার্টে। আমার সেই প্রেমিক আপনার মতো এমন তরল নয়। বাকসর্বস্ব নয়।

শচীন। রক্ষে করুন, তাই বলে আমি জোচ্চোর বন্ধু হতে পারবো না। (সুটকেশের কাছে মেঝের উপর বসে পড়ে পকেটে চাবি হাতড়াতে-হাতড়াতে) তোমার জন্য কতগুলি যে এবার শাড়ি কিনেছি শোভা-দি, সুপার্ব! বিকেলে গা ধোয়া তোমার হয়ে গেছে? এখুনি তবে পরো একখানা। আর রাতে চাঁদ উঠলে—

শোভা। (ধমকের সুরে) তুমি এখন স্নান করে খেয়ে নেবে না কিছু? বলছিলে না, খিদে পেয়েছে খুব।

শচীন। ও, হ্যাঁ, তোমাকে পেয়ে খিদে-তেষ্টা সব ভুলে গেছি। হ্যাঁ, চলো উপরে, এখানে ঠিক জমছে না। এ-ঘরটা বে-আব্রু, বড্ড বিদেশী। (দুই হাতে সুটকেশ আর বেডিং তুলে নিল)

শোভা। এ কি?

শচীন। এ-বাড়িতে যে আমি অনেক দিনের মতো থাকবো। থাকবো বলে নিচে চাকরদের এলাকায় থাকবো, মনে কোরো না। থাকবো উপরে, তোমাদের ঘরের পাশটিতে। ভয় নেই, তোমার কর্তার মত নিয়ে এসেছি। এখানে এসেই প্রথমে গিয়েছিলুম ওঁর স্টুডিয়ো। ওঁর সঙ্গে দেখা হলো, বললুম ওঁকে সব কথা।

শোভা! বললে? বললে যে এ-বাড়িতে থাকবে?

শচীন। শিখবো অভিনয়, নামবো ফিল্মে, ডিরেকটরের বাড়ি ছেড়ে থাকবো গিয়ে ভিখিরির আস্তানায়? নিত্যি খোসামোদ করতে হবে কত। তাঁকে, তাঁর শোভাঙ্গিনীকে।

শোভা। উনি কী বললেন শুনে?

শচীন। এমনিতে ভদ্রলোক তো, আপত্তি করতে পারলেন না। বললেন, সঙ্গী পেয়ে শোভার ভালোই লাগবে।

শোভা। তুমি সব ডোবাবে দেখছি।

শচীন। তাই আশীর্বাদ করো শোভা-দি, যেন বেশি দিন থাকতে না হয় এ-বাড়িতে, যেন ডোবাবার মতো শক্তি পাই, ভেসে তলিয়ে যেতে পারি অতলে।

জগন্নাথ। এইখানটায় কিছু মিল আছে আমার গল্পের প্রেমিকের সঙ্গে।

শচীন। এইখানটা বুঝি খুব গভীর! রক্ষে করো। দরকার নেই আমার গল্পের প্রেমিক হয়ে। তুমি এসো, শোভা-দি। (বাঁয়ের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। সুটকেশ আর বিছানা রইলো পড়ে।)

শোভা। (জগন্নাথের হাতে খাতাটা পৌছে দিতে-দিতে) আপনি একটুখানি বসুন—ওর স্নানেরটা গুছিয়ে দিয়েই আমি আসছি।

জগন্নাথ। হ্যাঁ, না, দেখি কতক্ষণ বসে। যতীশবাবু যদি এসে পড়েন এর মধ্যে। আপনারা তো কেউ পড়লেন না গল্পটা। ওঁকে যদি পড়াতে পারি দেখি।

শোভা। হ্যাঁ, আজকাল সময়ের ওঁর কোনো ঠিক নেই। এসে পড়তেও পারেন দু-পাঁচ মিনিটে! আচ্ছা—(বাঁয়ের দরজা দিয়ে প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। জগন্নাথ বসলো, উঠে পড়লো, পায়চারি করলো। পায়ে লাগতেই সুটকেশ আর বিছানা ঠেলিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। ফের বসলো। খাতার পাতা ওলটাতে লাগলো। ঢুকলো চাকর, দরজা বাঁ।)

চাকর। কোথায় মাল? (জগন্নাথ তাকিয়েও দেখলো না! চাকর নিজেই দেখলো। তুলে নিল দুহাতে।)

জগন্নাথ। (হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে এনে) দোতলার ও-বাবুটি কে?

চাকর। কে জানে! উনি শুধোলেন, একতলার বাবুটি কে, তাই বা কি কিছু বলতে পারলাম। কত লোকই তো আসছেন দুবেলা।

জগন্নাথ। কী করছে বাবুরা?

চাকর। গল্প—গল্প কি ফুরোয় ওদের? দিন-রাতই গল্প। (মাল নিয়ে প্রস্থান)

(আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। উপরে হাসির শব্দ। ডাইনের ভেজানো দরজায় আঙুলের গিঁটের মৃদু শব্দ শোনা গেল—এক, দুই, তিন।)

জগন্নাথ। (দরজার দিকে পিঠ) যদি সত্যি ঢুকতে চান, জোরে ধাক্কা দিন। প্রবলভাবে নিজেকে ঘোষণা করুন। দাবি মিহি করেছেন কি, খোলা-দরজাও খুলবে না।

(দরজা ঈষৎ ফাঁক হলো। দেখা গেল হিমানীর মুখ।)

হিমানী। আচ্ছা, এটাই কি যতীশবাবুর বাড়ি?

জগন্নাথ। (গলা শুনে চমকে পিছনে ফিরে তাকিয়ে) হ্যাঁ, আসুন। (ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বুকের উপর দুহাত একত্র করে ঈষৎ ঘাড় হেলিয়ে) নমস্কার।

(হিমানী ঘরে চলে এল। খুব ঝলমলে করে সাজা, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। যতদূর দুঃসাহসিক হতে পারা যায় পোশাকে, ততদূর। হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ।)

হিমানী। (দ্রুত) নমস্কার। যতীশবাবু আছেন বাড়িতে?

জগন্নাথ। বোধহয় নয়।

হিমানী। খোঁজ নিন তাড়াতাড়ি।

জগন্নাথ। আপনার কী দরকার—সিনেমা সংক্রান্ত যদি কিছু হয়—

হিমানী। না, না, সিনেমা-টিনেমা নয়। আমি স্টুডিয়ো থেকে ঘুরে আসছি, সেখানে উনি নেই, বললে, বাড়ি ফিরেছেন। শিগগির খোঁজ নিন। এখুনি আমাকে ফের বেরুতে হবে। অনেক কাজ বাকি। (সোফায় বসে পড়লো) অনেক কাজ।

জগন্নাথ। কিন্তু উনি তো ফেরেননি এখনো বাড়ি।

হিমানী। ফেরেননি? আপনি কী করে জানেন?

জগন্নাথ। আমি যে ওঁরই জন্যে বসে আছি। আমার কাজটা অবিশ্যি সিনেমাসংক্রান্ত। একটা গল্প। আচ্ছা, আপনি গল্প বোঝেন? কাকে আঙ্গিক বলে, কাকে বলে উদ্ঘাটন—ও-ইডিয়া আছে আপনার? যদি আপনার সময় থাকে যতীশবাবুর ফিরে আসা পর্যন্ত, তা হলে (খাতার পাতা ওলটাতে লাগল)

হিমানী। (গ্রাহ্য না করে) কে বললে আপনাকে উনি ফেরেননি? নিজে খোঁজ নিয়ে এসেছেন ভেতরে গিয়ে?

জগন্নাথ। দরকার হয়নি। কেননা অন্তঃপুরই এতক্ষণ এখানে অধিষ্ঠান করছিলেন সশরীরে।

হিমানী। কে ছিলেন বললেন?

জগন্নাথ! কেন, তাঁর স্ত্রী।

হিমানী। সে কি কথা? যতীশবাবুর স্ত্রী আছে নাকি?

জগন্নাথ। জ্বলন্ত রূপে আছেন। দেখবেন, ডাকবো তাঁকে?

হিমানী। কই, শুনিনি তো এমন কথা। তিনি বিয়ে করলেন কবে?

জগন্নাথ। এক যুগ কোন না হবে! কিন্তু মনে হয় যেন এই সেদিন! এত সজীব!

হিমানী। আশ্চর্য, এ-কথাটাই তিনি আমার কাছে চেপে গেছেন।

জগন্নাথ। এমনি অনেক স্খলন অনেক বিকৃতিই অনেকে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু আমি লুকোই না। আমি বলতে লজ্জিত নই যে আমি বিবাহিত। এবং, এও বলতে লজ্জিত নই, লগ্ন এলে আরো একবার আমি প্রস্তুত।

হিমানী। আপনি কি এ-বাড়ির কেউ?

জগন্নাথ। আমি কোন বাড়ির নই? আজ দেখছেন হয়তো পথে, কাল দেখবেন আপনার বাড়িতে। নেমন্তন্নের অপেক্ষা রাখবো না।

হিমানী। আপনি এ-বাড়ির আত্মীয়? সত্যি বলছেন, যতীশবাবু বিয়ে করেছেন?

জগন্নাথ। বিয়ের ব্যাপারে আপনার এত কুসংস্কার কেন? যে বিয়ে করেছে সে ফুরিয়ে গেছে বলতে চান?

হিমানী। না, তা নয়—

জগন্নাথ। তার তো সেই সুরু হলো জীবনকে চেখে দেখা। চোখে-দেখার চেয়ে চেখে-দেখাটা অনেক দামি। আর দরকার কী সন্দেহে, গৃহকর্ত্রী স্বয়ং আবির্ভূত হচ্ছেন।

(নতুন শাড়ি-পরনে শোভা ঢুকলো ঘরে, বাঁয়ের দরজা দিয়ে। সমুদ্র-সুনীল শাড়ির রং, সমস্ত গায়ে খসখস করছে। মুখ-চোখ উজ্জ্বল।)

জগন্নাথ। এই যে, ইনি—ইনিই যতীশবাবুর স্ত্রী।

হিমানী! ও! আপনি? আশ্চর্য! (একদৃষ্টে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ)

শোভা। (আধেক চেনা, আধেক অচেনা) আপনি—এখানে—

জগন্নাথ। ইনি খোজ নিতে এসেছেন আপনার স্বামী ফিরেছেন কিনা বাড়িতে। আমার মুখের উত্তর শুনে ইনি শান্তি পাচ্ছেন না। খোদ অন্দরের খবরটা উনি চান।

শোভা। না, উনি এখনো ফেরেননি তো বাড়ি। আপনার কোনো কাজ আছে ওঁর কাছে?

হিমানী। ভীষণ! (কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা, বলতে পারেন, ওঁর বম্বে যাবার কথা আছে আজ?

শোভা। বম্বে! কই, শুনিনি তো।

হিমানী। শোনেননি? আন্দাজ করতেও পারেননি তিনি কোথাও যাচ্ছেন? কিছুটা তাড়াহুড়ো, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা, একটুও অন্তত ব্যস্ততা—

শোভা। না তো।

হিমানী। যাবার হলে নিশ্চয়ই শুনতে পেতেন। কী বলুন?

শোভা। অন্তত বুঝতে পারতুম।

হিমানী। যাবার মনস্থ করলেও নিশ্চয়ই ''রে মত বদলেছেন।

শোভা। আশ্চর্য কী। সেইটেই সম্ভব।

জগন্নাথ। আর, মত বদলানোটাই তো প্রতিভার পরিচয়! মত যে না বদলায়—

শোভা। বম্বে কেন যাচ্ছিলেন জিগগেস করতে পারি?

হিমানী। কেন যাচ্ছিলুম! (নিশ্বাস ফেললো)

শোভা। স্যুটিং আছে?

হিমানী। না।

শোভা। কোনো কণ্ট্রাক্ট বা বিজ্‌নেস?

হিমানী। অন্তত আমি তো জানিনা।

শোভা। আপনি যা জানেন—

হিমানী। কারণটা ব্যক্তিগত। আপনাকে তা বলে লাভ নেই, প্রতিকারও নেই। কারণটা ভারতবর্ষের ওপারে। (ওঠবার জন্য উদ্যত)

শোভা। বেড়াতে যাচ্ছিলেন?

হিমানী। হ্যাঁ, যাচ্ছিলুম। আচ্ছা, উঠি। (উঠে পড়লো) নমস্কার। (প্রস্থান)

জগন্নাথ। তবু পারলো না যেন স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে নিজেকে। আমার সংস্পর্শে যদি আসতো শিখিয়ে দিতুম তাকে এই সত্যভাষণের সৎসাহস। উদ্দামের উদ্‌ঘাটন। আজকের দিনে তারই সাফল্য যে স্পষ্ট, রূঢ়, নির্বারিত। কিন্তু, আসল কথা, মহিলাটি কে?

শোভা। মহিলা! আগে কোনোদিন দেখেননি ওকে?

জগন্নাথ। দেখেছি কিনা—দাঁড়ান, আশ্চর্য, দেখিনি—তাই বা কী করে সম্ভব!

শোভা। কেন, দেখেননি ওকে পর্দায়?

জগন্নাথ। পর্দায়?

শোভা। হ্যাঁ, ইনি সিনেমা-আকাশের মিটমিটে একটি তারকা। নীহারিকা থেকে সবে আকার নিয়েছেন। নাম হিমানী সরকার। দেখেছি দু একবার ওকে ভ্যাম্পের পার্টে! শিস দিতে, চোখ মারতে, আর কোমর বাঁকাতে ওস্তাদ!

জগন্নাথ। বলেন কী! আমার গল্পে যে ভীষণ মানিয়ে যাবে তা'লে। কী আশ্চর্য, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না কেন?

শোভা। কে জানে এমন সায়ংস্মরণীয়ার সঙ্গে আপনার আলাপ নেই।

জগন্নাথ। জানেনই তো আমার প্রতিজ্ঞা। যদ্দিন সিনেমা-কোম্পানি আমার গল্প না নেবে ততদিন দেখবো না আমি বাঙলা ছবি। তাই কী করে চিনবো বলুন, কে তারকা কে বা জোনাকি। ছি ছি ছি, এমন একটা সুযোগ ফসকাতে দিলুম।

শোভা। এখনো ফসকায়নি সম্পূর্ণ। এখনো মোটর হয়নি হিমানীর। ট্রাম কিম্বা বাসের জন্যে হয়তো গেছে। চেষ্টা করলে ধরতে পারেন হয়তো।

জগন্নাথ। নিজের না হোক, আর কারু মোটর কি তার জন্যে মযুর হয়নি? তবু, লেট মি ট্রাই মাই লাক। শিস দেয়, চোখ মারে, কাঁকাল বাকায়—আমার গল্পের নায়িকার সহোদরা—আচ্ছা, আবার আসবো। (দ্রুত অন্তর্ধান)

(হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে চুমুক দিতে-দিতে ঢুকলো শচীন। খালি পা, গায়ে বোতাম-খোলা হাফ-সার্ট। সদ্য স্নান করা। ভিজে গায়ের আভাস।)

শচীন। কে চোখ মারে, শোভাদি?

শোভা। ঐ তোমাদের হিমানী সরকার। খানিক আগে এসেছিলো এখানে। ছেনালের একশেষ।

শচীন। বা, দাও না ওকে পতিব্রতার পার্ট। দেখবে নির্মল নিষ্পাপ মুখ আর নেই কোথাও বাংলা দেশে। বইয়ের মেয়েটা খারাপ বলে ও নিজে খারাপ হলো? আমাকে দিক না একটা লম্পট মাতালের পার্ট, তা হলে কি তোমার সামনে এমনি সোজা দুপায়ে দাঁড়িয়ে থাকবো? ল্যাকপ্যাক করবো না?

শোভা। তখন এক ধাক্কা মেরে ফেলে দেবো না তোমাকে মাটির উপর?

শচীন। দেবেই তো। তাই তো হবে তোমার পার্ট। কিন্তু যদি প্রেমিক হই, তোমার সঙ্গে বনে ছুটোছুটি করতে হয়, গাছের গুঁড়িতে বসতে হয় ঠেস দিয়ে, কিম্বা প্লে-ব্যাকে ডুয়েট গাইতে হয় গাছের ডাল ধরে, তখন বাধ্য হয়েই তোমাকে এগিয়ে আসতে হবে, মুখের কাছে মুখটা আনি-আনি করতেই ডিজলভ্ হয়ে যাবে দৃশ্যটা।

শোভা। তখনো চড় খাবে গালের উপর।

শচীন। বলা যায় না, কাঁধের উপরও খেতে পারি।

শোভা। কিন্তু হিমানী সরকার কেন এসেছিলো জানো?

শচীন। ও-রকম কত মেয়ে আসছে যতীশদার কাছে, কেউ স্টুডিয়োতে, কেউ বাড়িতে, আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

শোভা। না, এ একটু নতুন রকম। এ শুধু আসে না, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চায়।

শচীন। নিয়ে যেতে চায়? কোথায়?

শোভা। বোম্বাই।

শচীন। তবু ভালো। কেন, সেখানে কেন?

শোভা। (গম্ভীর) কারণটা নাকি ব্যক্তিগত।

শচীন। তবে কি তুমি ভাবছ পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করবার জন্যে ?

শোভা। তা নয়। কোনো সুটিং বা সিনেমার কাজের জন্যে নয়।

শচীন। নয়ই তো। যাবার মতলব যতীশদাকে ধরে কোনো হিন্দি বা উর্দু ফিল্ম-কোম্পানিতে একটা কণ্ট্র্যাক্ট বাগানো যায় কি না। বোঝো না ওদের আসল মতলব ? টাকার জন্যে এক শূন্য থেকে আরেক শূন্যে ঝম্পপ্রদান।

শোভা। আর জানো, আমি যে ওঁর স্ত্রী এ যেন কতো বড়ো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

শচীন। আশ্চর্যই তো! যে শুনবে সেই আশ্চর্য হয়ে যাবে। তুমি যে স্ত্রী, পূর্ব থেকেই অধিকৃতা, আঘ্রাতা, আলূনা—এ একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

শোভা। (সকোপকটাক্ষ) ভাগ্যিস কথাগুলো শক্ত করে বলেছ, নইলে মানহানির দায়ে পড়তে।

শচীন। কিন্তু বিচার করতো কে ? তোমার স্বামী ? যে প্রতিপক্ষ সেই বিচারক ?

শোভা। কেন, স্বামী কেন ? বিচার করতো সমাজ।

শচীন। সমাজ ? যে স্বামীকে সৃষ্টি করেছে ? ফ্যাসিস্ট স্বামীকে ? আমি আর তুমি ভবিষ্যতে যে-সমাজ গড়ে তুলবো তার কাছে কি আমি সম্মান পাবো না ?

শোভা। না, সেদিনও তুমি কানমলা খাবে। তুমি নিতান্ত বালক আর বাচাল বলে।

শচীন। দেখ, কথাটাই হচ্ছে মানুষের প্রকাশের বাধা, আর এমন দুষ্ট, কথা ছাড়া প্রকাশের অবলম্বনও আর কিছু নেই। যদি কথা না বলি, তোমাদের এমন বুদ্ধি নেই যে মনের কথাটা বুঝতে পারো; আর যদি কথা বলি, এমন তোমাদের দুর্বুদ্ধি, ভাবো বুঝি বাড়িয়ে

বললাম। আর দেখ, নিজে তুমি কানমলা দিতে চাও দাও, কিন্তু বালক বলে বিদ্রূপ কোরো না।

শোভা। (কৌতুকোজ্জ্বল) বালক নয়তো কী। নাবালক!

শচীন। তোমার চেয়ে বয়সে আমি ছোট কটাক্ষটা তো এইখানে? কিন্তু সেই জৈব দুর্ঘটনার কথা ছেড়ে দাও, শোভাদি। যা মাত্র য়্যাকসিডেণ্ট তাকে বড়ো করে দেখো না। যেটা স্বভাবের থেকে জন্মায়, স্বভাবের থেকে বাড়ে, বাইরের বাধাবন্ধকে অগ্রাহ্য করে, তাকেই মূল্য দিয়ো। সেই দৈবশক্তিতে যে বলী সেই সত্যিকারের বড়ো, শোভাদি।

শোভা। তা হলে তুমি আমার চেয়ে বড়ো বলতে চাও?

শচীন। হ্যাঁ, নিশ্চয়। তোমার বিয়ে হয়েছে আজ আট বছর, তখন তোমার বয়স কুড়ি, সেই থেকে তুমি থেমে আছ. বাড়োনি আর এক চুল। কিন্তু আমি এসেছি বেড়ে, আকাঙ্ক্ষা থেকে আকাঙ্ক্ষায়! হ্যাঁ, জানি, তোমার ছেলে আছে একটি ছ বছরের, কিন্তু জানো, মাতৃস্নেহ কখনো বাড়ায় না, বড়ো করে না। যা বড়ো করে সে হচ্ছে প্রেম। তাই তুমি আছ সেই কুড়িতেই, আর আমি আজ এই চব্বিশ ছেড়ে পচিশে পৌঁছেছি।

শোভা। তুমি এমন সুন্দর করে কথা বলো শচীন, যে তোমার জন্যে আমার বড্ড মায়া হয়।

শচীন। আমি হতভাগ্য। তুমি ভাবো আমি অক্ষম, দুর্বল, কিন্তু একদিন যদি প্রমাণ করবার সুযোগ দাও শোভাদি, দেখবে আমাকে নিয়েও গর্ব করা চলে। একদিন সে-সুযোগ যেন পাই, আজকের এই মায়াকে নিয়ে যেতে পারি মোহে, এই আমার প্রার্থনা।

শোভা। তোমাকে নিয়ে আমার অদৃষ্টে কী বিড়ম্বনা যে আছে কে-জানে।

শচীন। সে-ক্লেশের ভার আমাকে নিতে দিয়ো, শোভাদি। সত্যি আমার মন এই শুধু চায় যে তুমি ভীষণ বিপদে পড়ো, গভীর যন্ত্রণার মধ্যে, আর আমি তোমাকে উদ্ধার করি, প্রমাণ করি আমি মূল্যবান, আমি অপরিহার্য। আমি যে ছোট এই অপৌরুষ আর সইতে পারি না। আচ্ছা, আজ সাড়ে ন-টার শোতে সিনেমায় গেলে হয় না? যাবে?

শোভা। শেষ পর্যন্ত সেই সিনেমায়? আর কিছু তুমি ভাবতে পারলে না?

শচীন। আরো কত কী ভাবা যায়। চলো না মোটরে করে ঘুরি সমস্ত রাত।

শোভা। আর কিছু?

শচীন। চলো না, দুজনে মিলে বম্বে চলে যাই। তারপর জাহাজে করে—

শোভা। এইবার ক্ষীণ একটু রোমাঞ্চ অনুভব করছি।

(দরজা ঠেলে যতীশের প্রবেশ। দীর্ঘায়ত, হৃষ্টপুষ্ট, সদাব্যস্তভাব। হাফসার্ট, ট্রাউজার, কাবলি স্যাণ্ডেল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। এক হাতে পোর্টফলিও, অন্য হাতে পাইপ।)

যতীশ। এই যে, তোমরা দুজনেই আছ। ভালো কথা। এ কি, তোমরা এখনো বেরোওনি বেড়াতে? ব্যারাকপুর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড? লেকস? বাঃ, কী চমৎকার শাড়িটা তোমার! কিনলে কবে?

শোভা। শচীন দিয়েছে।

যতীশ। আমি আগেই বুঝেছি। সাধ্যের যা বাইরে তারই উপর ওর আকর্ষণ। দাম পড়লো কতো শাড়িটার?

শচীন। দামের কথা জিগগেস করবেন না। দেখুন একবার শোভাদিকে। কী মনে হয়? মনে হয় না একটা নীল উত্তাল সমুদ্র!

যতীশ। গর্জন নেই, এই যা রক্ষে। তার চেয়ে নদীতে নিয়ে

এসো। 'তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি।' তোমার রুচি আছে যাই হোক। শোনো, তোমাদের জন্যে সাড়ে ন'টার শোতে দুটো টিকিট কিনে এনেছি মেট্রোর। রিমার্কেবল ফিলম। দেখে এসো দু'জনে।

শচীন। (উৎফুল্ল) গ্রেট! এইমাত্র বলছিলুম শোভাদিকে। আশ্চর্য, প্রার্থনা ঐকান্তিক হলে মিটে যায় শেষ পর্যন্ত। চলো শোভাদি, এখুনি বেরিয়ে পড়ি আমরা। ড্রাইভ, তোমার দু-একটি হাই-হিলি বন্ধুর বাড়ি, বিকল্পে রেস্তরাঁ, পরে সিনেমা। বেশ একটি তির্যক কবিতা। ছন্দের বন্ধন নেই বলেই স্বচ্ছন্দ।

যতীশ। আমি তো ভেবেছিলুম তোমরা বোধহয় বেরিয়ে পড়েছ এরি মধ্যে! একি, তুমি খালি পা! এতক্ষণ লাগে তোমার তৈরি হতে? তুমি কী!

শচীন। দু মিনিট। (দ্রুত প্রস্থান।)

শোভা। (এগিয়ে এসে) তুমি যাবে না সিনেমায়?

যতীশ। আমি দেখেছি আগে।

শোভা। তখন আমাকে সঙ্গে নাও নি কেন?

যতীশ। সেবার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, দলে পড়ে। আগে থেকে ঠিক ছিল না।

শোভা। এখন যখন আগে থেকে ঠিক হয়েছে তখন যেতে হবে তোমাকে আমাদের সঙ্গে। বইটা যখন রিমার্কেবল তখন দুবার দেখতে নিশ্চয়ই তোমার খারাপ লাগবে না। আরেকখানা টিকিটের জন্যে এখুনি ফোন করে দাও।

যতীশ। কেন, একা শচীনের সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করে?

শোভা। না, তা নয়। তবু তুমিও সঙ্গে থাক এই বড্ড ইচ্ছে করছে আজ।

যতীশ। এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় শচীনের উপর। এরকম

উঁচু-মন ছেলে দেখা যায় না। আর তোমাকে সে কত ভালোবাসে। তোমার জন্যে সে প্রাণ দেয়। আর তোমার এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই? উলটে তাকেই অবিশ্বাস করো?

শোভা। করি না অবিশ্বাস, তবু তুমি চলো। যদি শচীনকে বলি তার টিকিটে তুমি যাবে সে এক্ষুনি রাজি হয়ে যাবে। আমার জন্যে সে রাজত্ব ছেড়ে দিতে পারে আর এ তো সিনেমার একটা টিকিট! না, লক্ষ্মীটি, তুমি চলো।

যতীশ। আমি যাবো যে, আমার সময় কোথায়? আমাকে এক্ষুনি বম্বে যেতে হবে।

শোভা। কোথায়?

যতীশ। বম্বে।

শোভা। বম্বে? এমন ভাবে বলছ যেন শ্যামবাজার বা বেলেঘাটা যাচ্ছ। আশ্চর্য, একটুও উত্তেজিত হচ্ছ না।

যতীশ। উত্তেজনার আছে কী। বম্বের আরো পশ্চিমে হতো, তবে না-হয় মনে-মনে খানিক দুলতুম।

শোভা। তেমন কোনো জল্পনা এখনো নেই বুঝি?

যতীশ। থাকলে তুমি বাদ পড়তে নাকি?

শোভা। ও! পড়তুম না তা হ'লে। কিন্তু, কেন যাচ্ছ বম্বে?

যতীশ। কাজ আছে। একটা হিন্দি ছবির কণ্ট্র্যাক্ট পাবার কথা আছে।

শোভা। তাই নাকি? ছবির হিরোয়িন ঠিক হয়ে গেছে?

যতীশ। এখুনি হিরোয়িন কী! বইয়ের দেখা নেই, এখুনি হিরোয়িন! কেন, তোমার ইচ্ছে করে নাকি নামতে?

শোভা। আমি—আমি নামবো সিনেমায়? তোমার স্ত্রী হয়েছি বলে কি আমার এতটুকু মর্যাদা নেই?

যতীশ। নামলে মর্যাদা বাড়তো বই কমতো না। অভিনয়ও একটা খুব বড় গুণ। সে-গুণের কাছে স্বাদহীন সতীত্বের কোনো জৌলুস নেই।

শোভা। সে-পাঠ আমার তোমার কাছ থেকে নিতে হবে না। বম্বে যাচ্ছ যে, একা যাচ্ছ?

যতীশ। তা ছাড়া আবার কী! সঙ্গী পাবো কোথায়?

শোভা। (ঝংকৃত) কেন, তোমার হিমানী সরকার যাবে না সঙ্গে?

যতীশ। (হতভম্ব) কে, কী সরকার?

শোভা। হিমানী সরকার। তোমার আকাশের নতুন সন্ধ্যাতারা। সে যাবে না তোমার সঙ্গে? রিজার্ভ কামরায়? ফার্স্ট ক্লাশ কুপ্-এতে?

যতীশ। সে যাবে কি না-যাবে তার আমি কী জানি?

শোভা। তার তুমি কী জানো! সে যে এসেছিলো এখানে। তোমার সঙ্গে যাবার জন্যে যে সে অস্থির।

যতীশ। কে অস্থির? কে এসেছিলো এখানে?

শোভা। তোমার হিমানী। হিমোলিনী।

যতীশ। হা হা হা। সে নাম বলেছে তার? কে না কে এসেছিলো অমনি ধরে নিলে হিমানী সরকার। হা হা হা।

শোভা। পারলে না, পারলে না হাসিটা ফোটাতে। মিথ্যায় গলা কাঠ হয়ে গেছে। আমি চিনিনে সেই ছেনালীকে? তার গালের হাড় দুটো পর্যন্ত আমার চোখে বিধে রয়েছে। খানিক আগে তোমার এ্যালবাম খুলে মেলালুম তার মুখ—সে-ই অবিকল! আমার ভুল হবে?

যতীশ। আমি বিশ্বাস করি না।

শোভা। আর তারও বিশ্বাস করতে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, আমি তোমার স্ত্রী। সে বোধ হয় চাচ্ছিল একটা নির্লজ্জ নৈরাজ্য। আমি তার কাছে মনে হলুম যেন ঘোরতর অনাসৃষ্টি।

যতীশ। তবে কখনোই হিমানী নয়। সে জানে আমি বিয়ে করেছি।

শোভা। আর, সে-বউ বেঁচে আছে? জানে? জানে তো এমন তার অন্তর্দাহ কেন? কেন তার স্বপ্নভঙ্গের নিরাশ্বাস?

যতীশ। তুমি দড়ি দেখতে কেবল সাপ দেখছ।

শোভা। যেহেতু সে-দড়ি তোমার গলায় গিয়ে জড়িয়েছে। হিমানীই হোক আর হিলানীই হোক, একটা বাজারে মেয়ের সঙ্গে তুমি আজ বম্বে যাবার মতলব করেছ, আর বম্বে থেকে ওপারে—

যতীশ। মুখ সামলে কথা বলো, শোভা।

শোভা। কেন, যে যা তা বলতে পারবো না? বাজারে মেয়ে বলেই তো স্ত্রীত্বের সামনে অমন ম্লান হয়ে গেল। মাথা তুলতে পারলো না।

যতীশ। রেখে দাও তোমার স্ত্রীত্বের বড়াই। তুমি—তুমিই বা কী সব—সব এক ঝাঁকের কই, এক ক্ষুরেই সবাই মাথা মুড়িয়েছ। জানিনা আমি?

শোভা। আমি? (সোফায় বসে পড়লো)

যতীশ। হ্যাঁ, তুমি। তোমার পরনের ঐ শাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছে, তুমি। কার কামচক্ষুর লেহন এই শাড়িতে? কার আলিঙ্গনকে অমন ফেনায়িত করে গায়ে জড়িয়েছে? কার এই তৃষ্ণার তরঙ্গ?

(শচীনের আবির্ভাব। বেরুবার জন্যে তৈরি)

শচীন। শোভাদি! সহ্য কোরো না, সহ্য কোরো না এই অত্যাচার। এই পাপপুরী থেকে চলে এসো বেরিয়ে।

যতীশ। যদি সত্যোপলব্ধি থাকে তবে যাওয়াই উচিত একশো বার। দরজা খোলা আছে আমার বাড়ির। বেরুবার আর ফেরবার। আগাগোড়া সত্যহীনতার চেয়ে মাঝে-মাঝে সত্যের স্ফুরণ আর নির্বাপণ অনেক ভালো।

শচীন। তবু তুমি চুপ করে বসে থাকবে, শোভা-দি? সাপের মতো ফণা তুলে উঠবে না? গা পেতে নেবে এই অপমান—সমস্ত নারীত্বের প্রতি অপমান? গর্জে উঠবে না তোমার এই সুপ্ত শাড়ির সমুদ্র?

যতীশ। ভেবেছিলুম আমার মতো উদার বুদ্ধিই তোমার হবে। নিজের সঙ্গে-সঙ্গে মেনে নেবে পরের অনুভূতিও। সেই জন্যে বাধার দেয়াল তুলে আটকে রাখিনি আমি বাইরের গতায়াত। কিন্তু নিজের বেলায় যেটা নির্দোষ অন্যের বেলায় সেটা পাপ, এই স্বার্থান্ধতা অত্যন্ত হীন, কুৎসিত মনেরই প্রতিচ্ছায়া।

শচীন। তবু তুমি দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছ না, শোভাদি? তোমার এই লজ্জায় আমার বুক দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এ লজ্জা যে আমারো লজ্জা। একবার এবার সুযোগ দাও, প্রমাণ করি আমি আমার ভারবহনের ক্ষমতা, তোমার জন্যে ক্লেশসহনের অক্লান্তি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ শোভা-দি, ফলেছে আমার সেই আকুল প্রার্থনা—তুমি পড়েছ ভয়ানক বিপদে, অপমানের পঙ্ককুণ্ডে, আর আমার মিলেছে সুযোগ, তোমাকে উদ্ধার করবার, তোমাকে স্থান করে দেবার। তুমি এসো। (শোভার হাত ধরলো)

শোভা। (সবলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়লো এক ঝটকায়) বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি ছেড়ে।

শচীন। (আকাশস্খলিত) আমি?

শোভা। হ্যাঁ, তুমি। যাও।

শচীন। তোমার বাড়ি?

শোভা। হ্যাঁ, আমার বাড়ি।

শচীন। আর শাড়িখানা?

শোভা। তাও আমার। আমার স্বামীর টাকায় কেনা। দেখেছি

:তোমার মনিব্যাগের ফোকরে সেই মনি-অর্ডারের কুপন। যাও। যাও বেরিয়ে।

(শচীন হতভম্বের মতো বেরিয়ে গেল। শোভা আলুল আঁচলে নিষ্ক্রান্ত হলো বাঁয়ের দরজা দিয়ে উপরে। একটু স্তব্ধতা। ঢুকলো জগন্নাথ।)

যতীশ। (ক্লান্ত) এই যে আসুন। কেমন আছেন? (পাইপ ধরালো)

জগন্নাথ। কেটে যাচ্ছে। আপনি?

যতীশ। কদর্য।

জগন্নাথ। আমি আরেকবার এসেছিলুম এর আগে। তখন আপনি ছিলেন না বাড়ি। তখন আপনি ভালো ছিলেন আশাকরি।

যতীশ। সম্ভব।

জগন্নাথ। এখন বাড়ি ফিরে দেখেন বুঝি হাওয়া গিয়েছে বদলে।

যতীশ। কিন্তু কেউ আপনারা একটা ঝড় তুলতে পারলেন না, দিকদিগন্ত অন্ধকার-করা কালো হাওয়ার ঝড়!' অল্প জলে কাদাই করলেন খালি, বিপুল বর্ষণে শাদা করতে পারলেন না চারদিক।

জগন্নাথ। আমি—আমাকে আপনি কী বলছেন!

যতীশ। কিছু বলছি না। বলছি, আপনার এখন চলছে কয় নম্বরের প্রেম?

জগন্নাথ। কী আপনি বলছেন যা-তা?

যতীশ। এ-বাড়িতেই চলছে এমন বলছি না—জীবনে চলছে এখন আপনার কয় নম্বরের নির্দেশ? অষ্টাদশ না চতুর্বিংশ।

জগন্নাথ। যদি কনফাইড করতে বলেন তো বলি, একাদশ।

যতীশ। একাদশ! এবং প্রত্যেকটাই এমনি ধূর্ত, কূট, কপট? নিজের স্থূল স্বার্থসিদ্ধির বাইরে আর কোনো তার স্থান নেই? সর্বত্রই কি আপনার এক কারুকার্য?

জগন্নাথ। যার যেমন জীবনদর্শন। যে যায় লঙ্কায় তাকেই রাবণ হতে হয়। উপায় কী?

যতীশ। এর মধ্যে একবারো একটা বড়ো অনুভব পেলেন না বুকের মধ্যে? বড়ো একটা ব্যর্থতার উদারতা, ব্য র্থতার শান্তি!

জগন্নাথ। ক্ষমা করবেন, এ-ব্যাপারে বৃহৎ কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যেটা হারানো সেটা হারানোই, হাত ধুয়ে ফেলা। আর যেটা পাওয়া, ছলেই হোক বা ছোবলেই হোক, সেটা আসলে পাওয়াই, ব্যবহারে ক্ষয় তার হবেই। সমস্তই একটা ভ্রান্তি আর ক্লান্তির প্রশ্ন। এর মধ্যে বড়ো-ছোট কিছু নেই।

যতীশ নেই?

জগন্নাথ। পড়ে দেখুন আমার এবারের এই গল্পটা। শুধু সিনেমার পক্ষেই উপযোগী নয়, জীবনের নতুন ভাষ্য, বঙ্কিমতম দৃষ্টিকোণ।

যতীশ। কী নিয়ে লিখেছেন এই গল্প?

জগন্নাথ। চতুষ্কোণ গল্প। চতুষ্কোণ শুনে ঠিকই বুঝতে পেরোছলেন মিসেস সেন। সন্দিগ্ধ স্বামী, নির্বোধ স্ত্রী, বঞ্চক বন্ধু আর ভাবতরল প্রেমিক। জটিল, গ্রন্থিল একটা প্লট।

যতীশ। স্বামীটা শুধুই সন্দিগ্ধ?

জগন্নাথ। আর কিছুটা হয়তো ষড়যন্ত্রী।

যতীশ। হুঁ! তার বাইরে আর তার জন্যে আকাশ রাখেন নি? রাখেন নি তার জন্যে কোনোই সমর্থন, এতটুকু সহানুভূতি? (উঠে পড়ে) চলবে না, চলবে না আপনার গল্প। ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিন ছুঁড়ে।

জগন্নাথ। আপনি আগে একবার পড়ে দেখুন। তারপর বুঝিয়ে দেব আপনাকে কোথায় আপনার বুদ্ধির জড়তা। তর্কে আমার সঙ্গে পারবেন না আপনি।

যতীশ। সেই জন্যেই গল্প আপনার ভালো হয়ে গেল! তর্কের

সূত্রটি কী চমৎকার! আপনার গল্প পড়ে দেখবার দরকার হয় না। শুধু আপনার চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায়, অত্যন্ত বিতিকিচ্ছি, বাজে গল্প।

জগন্নাথ। এতে আমার ধৈর্যচ্যুতি হবার নয়, কেননা এ যুক্তিটাও আপনার অপরিণত বুদ্ধিরই প্রমাণ।' যতক্ষণ না আমার গল্প আপনি পড়েছেন আর তর্কে না পরাস্ত করেছেন আমাকে, ততক্ষণ মেনে নেব না আপনার প্রত্যাখ্যান।

যতীশ। মেনে না নেন, মাসিক পত্রে ছাপুন গে। চলবে না সিনেমায়।

জগন্নাথ। কেন, সিনেমার সব কিছু প্যাঁচই আমি রেখেছি। শত টানাহেঁচড়া ধস্তাধস্তির পরেও সেই পাতিব্রত্যের জয়, পুণ্য পুনর্মিলন। ইচ্ছে করলে ট্রেন দেখাতে পারবেন বার কয়েক, নদীর উপরে পূর্ণিমার চাঁদ, আর ড্রয়িংরুমের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ঘন-ঘন ওঠা-নামা। বাইজিকে নাচিয়ে ঝুমুর বা কেত্তন গাওয়াবারো জায়গা আছে।

যতীশ। না, না, অমন ছোট জিনিস আমি আর দেব না দেশকে। যদি বড়ো জিনিস কিছু লিখতে পারেন, নিয়ে আসবেন, পড়ে দেখবার পরিশ্রমটা অন্তত সার্থক হবে।

জগন্নাথ। বড়ো জিনিস! কাকে আপনি বড়ো জিনিস বলেন?

যতীশ। বড়ো জিনিস যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে প্রেম।

জগন্নাথ। তার বড়োত্বটা কোনখানে? ত্যাগে, বর্জনে, ব্রহ্মচর্যে? সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে যাওয়ায়?

যতীশ। না, তার বড়োত্বটা বৈফল্যে।

জগন্নাথ। শরৎ চাটুজ্জের দেবদাসে? রোগ হয়ে মারা যাওয়ায়?

যতীশ। সে-বৈফল্য নয়। কী করে বোঝাই আপনাকে। আপনার মনের মেক-আপই তা নয়। এ-বৈফল্য না পাওয়ার নয়, নিজেকে

বিকশিত করতে না-পারার বৈফল্য। ধরুন, এমনিধারা একটা প্লট। স্বামী—একদিকে স্ত্রী, অন্য দিকে প্রিয়া। একদিকে স্নেহ, করুণা, আসক্তি : অন্য দিকে মৃত্যুর আহ্বান, দিগন্ত পর্যন্ত শুভ্রতা। স্ত্রীর কাছে শত কান্নায়ও নেই মুক্তি, প্রিয়ার কাছে শত প্রার্থনায়ও নেই ক্ষমা। স্ত্রীকে ছাড়তে হলে বিবেক বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওঠে, আর প্রিয়াকে ছাড়তে হলে পৌরুষ হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। লিখতে পারেন এমন একটা ব্যর্থতার ইতিহাস? ছিল মাটি, ছিল সূর্য, এক থেকে আরেকে লতা উঠেছিলো আঁকুপাঁকু করে, কিন্তু তাতে না ফুটলো ফুল, না বা হলো তাতে রান্নার তরকারি। পারেন লিখতে?

জগন্নাথ। এ তো অত্যন্ত ছেলেমানুষি প্লট। লেখক যদি বুদ্ধিমান হয়, স্বামীটিকেও সে বুদ্ধিমান করবে। তাকে অমন বোকার মতো ব্যর্থ হতে দেবে না। সাপও মারাবে, লাঠিও ভাঙাবে না। সাধের কাজলও পরাবে, চক্ষুও কাণা করাবে না। এবং আমি একজন বুদ্ধিমান লেখক এই আমার ধারণা।

যতীশ। নিজের ধারণা নিয়ে ধুয়ে খান গে যান। বুদ্ধিসর্বস্ব হৃদয়হীন লেখকে আমার দরকার নেই। আপনি এখন চলে যান এখান থেকে।

জগন্নাথ। আজকে মেজাজ আপনার ভালো নেই। কিন্তু ছেলে-মানুষি প্লট নিয়েও তো গল্প আমি পারি লিখতে। তাই দেখবো না হয় চেষ্টা করে।

(হিমানীর আবির্ভাব। ডাইনের দরজায়।)

যতীশ। হ্যাঁ, দেখবেন চেষ্টা করে। অন্তত একটা বড়ো জিনিসের কল্পনায় মনে যা প্রক্রিয়া হবে, তাতে, আর যাই হোক, চেহারায় কিছু কান্তি, কিছু ভদ্রতা আসবে আপনার। জীবনে তো কোনো দিন সৎচিন্তা করেননি, কেবল শাঠ্য আর খোসামোদ নিয়েই কারবার করেছেন, খুঁজে

বেড়িয়েছেন শুধু নিজের সুযোগ আর পরের সর্বনাশ, এবার এখন একটা মহৎ ভাবের আশ্রয়ে এসে চরিত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটেও যেতে পারে বা। সেইটেই বা কী কম লাভ ?

জগন্নাথ। (হিমানীকে লক্ষ্য করে) এই আসছেন আপনার একটি বড়ো জিনিস। আর একটি বড়ো জিনিস হয়তো দোতলায় অপেক্ষা করছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মহৎ হবার জন্যে এদের কথা যদি চিন্তা করি তবে চেহারাটা না আরো অসভ্য হয়ে ওঠে। (প্রস্থান)

যতীশ। ও! তুমি? তুমি আরেকবার এসেছিলে আগে ?

হিমানী! হ্যাঁ, এসেছিলুম।

যতীশ। কেন এলে বলো তো ? তোমার সঙ্গে তো স্টেশনে দেখা হবার কথা। বাড়ি এলে কেন ?

হিমানী। কোনো দিনই তো মনে হয়নি তোমার বাড়ি আসি। কিন্তু আজ চলে যাব তোমার সঙ্গে, ভাবলুম আগ বাড়িয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাই তোমাকে। যেন পাচ্ছিলুম না আর দূরে থাকতে। কিন্তু ভাগ্যিস এসেছিলুম তোমার বাড়ি।

যতীশ। বেশ তো, আবার এসেছ।

হিমানী। হ্যাঁ, জিগগেস করতে এসেছি তুমি আমার সঙ্গে এই ছলনাটা করলে কেন ?

যতীশ। ছলনা? আমি বিয়ে করেছি এই খবরটা তোমাকে জানাইনি বলে তুমি সেটাকে ছলনা বলছ ? সেটা এমন কী একটা জরুরি খবর যে তোমাকে না বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ?

হিমানী। বিয়ের খবরটা জরুরি নয় তোমার কাছে ? তা হলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতো না ?

যতীশ। হতো বৈ কি।

হিমানী। তা হলে আমাকে জানানো তোমার উচিত ছিল না যে তুমি বিয়ে করেছ আগে?

যতীশ। কিছুমাত্র না। কেননা আমি যা তা আমিই, তুমি যা তা তুমিই। আমাকে যখন তুমি ভালোবেসেছিলে, প্রশ্ন করবার দরকার হয়নি আমার স্ত্রী আছে কি না। তোমাকে যখন আমি ভালোবেসেছিলুম সন্দেহও হয়নি তোমার অতীত আছে কিনা। তুমি তুমি, আমি আমি। আর জানতে পারলেই বা কী এসে যায় তাতে?

হিমানী। কিছুই এসে যায় না? যেতে তুমি আমার সঙ্গে?

যতীশ। নিশ্চয়ই। এই দেখ বম্বের টিকিট। এই দেখ রিজার্ভেশ্যন স্লিপ। (মনিব্যাগ খুলে টিকিট দেখালো)

হিমানী। এখনো তুমি আমার সঙ্গে যাও?

যতীশ। নিশ্চয়ই। এখনো আমি প্রস্তুত।

হিমানী। যাবে? ছেড়ে যেতে পারবে তোমার বাড়ি-ঘর, তোমার স্ত্রী, আত্মীয়সমাজে তোমার প্রভাব-প্রতিপত্তি? পারবে?

যতীশ। এই মুহূর্তে। চলো না। ট্রেনের এখনো সময় আছে। আর বম্বে না হলেই বা কী। যে কোনো ট্রেনে যে কোনো জায়গায়। দেখ না যেতে পারি কি না।

হিমানী। না। (ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়লো সোফায়, হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছলো) তুমি যাবে না। পারো না যেতে। গেলেও বম্বেতে আমাকে কোথাও ফেলে একা ফিরে আসবে কলকাতায় তোমার স্ত্রীর কাছে। তক্ষুনি-তক্ষুনি না আস, আসবে কয়েক দিন বা কয়েক মাস পরে, যখন কৌতূহল ক্লান্ত হয়ে আসবে।

যতীশ। কৌতূহল ক্লান্ত হবে না বলেই তো তোমাকে চাই, হিমানী। (একটু নুয়ে পড়ে) তোমার অভিনয়ের প্রতিভা, তোমার ব্যক্তিত্বের দীপ্তি আনতে দেবে না কোনো অবসাদ। আর, এই অবসাদে ডুবে

আছি বলেই তো হাত বাড়িয়েছি তোমার সুরের স্বপ্নলোকে। চলো, আমাকে নিয়ে চলো।

হিমানী। না, আমি তোমাকে সুর দিয়ে স্বপ্ন দিয়ে পেতে চাইনি। অভিনয়ের অবাস্তবতা দিয়ে ধূসর করে নিতে চাইনি সত্যকে। সহজের মধ্যে, স্থূলের মধ্যে, স্বাভাবিকতার মধ্যে পেতে চেয়েছি। তাই বিয়ের প্রতি আমার এত আস্থা, বউয়ের প্রতি আমার এত মূল্য। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলতে পাচ্ছ না অভিনেত্রী বলে। যা নয় তাই দেখাবার ছদ্মবেশিনী বলে।

যতীশ। যা নয় তাই?

হিমানী। হ্যাঁ, তাই আমাকে বলছো নিয়ে যেতে তোমাকে, তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ না। ভাবছ, এ অভিনেত্রী, এর স্থান তো মঞ্চে কিম্বা পর্দায়, গৃহে কিম্বা সমাজে নয়, তাই পেরেছ এমনি দায়িত্বহীনের মতো ব্যবহার করতে। কিন্তু, না, আমি সইবো না এই অবহেলা, এই অমর্যাদা—

(বাঁয়ের দরজার ধারে শোভা এসে দাঁড়ালো। শাড়িটা বদলে এসেছে। অত্যন্ত সাধারণ সাংসারিক শাড়ি। নিজের স্থিতিবোধ সম্বন্ধে অত্যন্ত স্থির ভঙ্গি।)

হতে পারবো না তোমার স্ত্রীর উপরি-পাওনা। ভাবতে দেব না আমাকে তোমার রক্ষিতা বলে। অবসরের বিনোদিনী বলে। দুদিন ফুর্তি করে ফেলে দিয়ে যাবে আরেক দরজায়, তোমাকে হতে দেব না সেই নিলজ্জ শয়তান—

যতীশ। এইখানটা তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। এমনি— (বসলো, সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়লো) 'তোমাকে হতে দেব না সেই নির্লজ্জ শয়তান—'

হিমানী। উঠে দাঁড়াতে হবে?

যতীশ। হুঁ। নইলে পার্টটা এফেকটিভ হবে না।

হিমানী। পার্ট? পার্ট বলছি আমি?

শোভা। (এগিয়ে এসে) আর উনি আপনাকে ডিরেক্ট করছেন! উনি যে একটি নিরেট শয়তান তাই দেখাচ্ছেন নিজে অভিনয় করে।

হিমানী। ও। আপনি? তাই আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে? ককখনো না। আমি বসে থাকবো আমার নিজের জায়গায়। নিজের অধিকারে।

(যতীশ পাইপটা কামড়ে ধরলো। পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে একটা কাঠি ধরালো। ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল সেটা। ধীরে চলে গেল ভিতরে।)

শোভা। (বসলো মুখোমুখি) এ আপনার নিজের জায়গা?

হিমানী। আপনি যদি ভাবতে পারেন আমিই বা ভাবতে পারবো না কেন? আমিই বা আপনার চেয়ে কম কিসে?

শোভা। তবে আপনাকে যদি আমি এখন বাড়ি থেকে চলে যেতে বলি, আপনি যান না?

হিমানী। ককখনো না। আমিই যদি আপনাকে বলি, আপনি যান? যান না। বলেন, আপনি বলবার কে? তেমনি আমিও বলবো, আপনার হুকুমের কে তোয়াক্কা রাখে?

শোভা। এটাও কি আপনার পার্ট নাকি?

হিমানী। যদি তাই ভাবতে চান, ভাবুন। সঙ্গে এটাও ভাববেন, এর পিছনে রীতিমতো ডিরেকশন আছে। এবং তারি জোরে ভাবতে পারছি এ-ঘর আমার, এর ঘরণী আমি।

শোভা। ভেবে যদি সুখ পান তো ভাবুন। কিন্তু, ঘর ছেড়ে তবে পালিয়ে যাচ্ছিলেন কেন বোম্বাই?

হিমানী। তখন জানতুম না সে-ঘরের আপনি আছেন প্রতিদ্বন্দ্বী। যখন জেনেছি তখনই দখল নিতে এসেছি ষোল আনা। এবার পালাবার পালা আপনার।

শোভা। আচ্ছা, সিনেমার মেয়েগুলোর কি হায়া নেই? এত বঞ্চনার পরেও তারা আঁকড়ে থাকে?

হিমানী। থাকবে না কেন, তারা যে খারাপ মেয়ে। কিন্তু ঘরের বউগুলোই বা কী! এত অপমানের পরেও অন্তত বাপের বাড়ি পালায় না? না পালায় তো গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ে না সিলিঙ থেকে? কেন, কড়া নেই একটাও সিলিঙে? নেই তো, বিষ? আফিং?

শোভা। কেন, আপনার দরকার?

হিমানী। আমি মরতে যাবো কেন? আমি তো জয়ী।

শোভা। দেখা যাক।

হিমানী। দেখুন।

ডাইনের দরজাব শচীনের আবির্ভাব)

শচীন। শোভাদি!

শোভা। (রোষপ্রজ্বলিত) খবরদার! ঢুকতে পাবে না এ-বাড়ি।

হিমানী। (শান্ত) আমি বলছি আপনি ঢুকুন।

শোভা। ভালো হবে না বলছি, শচীন।

হিমানী। চমৎকার হবে, শচীনবাবু। আপনি নির্ভয়ে চলে আসুন ভেতরে।

শোভা। তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম।

হিমানী। সে-তাড়ানোটা বে-আইনি হয়েছিলো। কেননা যিনি তাড়িয়েছিলেন তাঁর একতিয়ার ছিল না।

শোভা। খবরদার শচীন, এ-বাড়ি আমার।

হিমানী। দানপত্র রেজেস্ট্রি হয়ে গেছে, এ আমার বাড়ি। আপনি স্বচ্ছন্দে চলে আসুন, শচীনবাবু।

শচীন। (ঢুকে পড়ে) আমাকে মাপ করো, শোভাদি—

হিমানী। (উঠে পড়লো) হা হা হা, কে জিতলো? বহাল রইলো কার কর্ত্রীত্ব?

(যতীশের প্রবেশ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে চটিজুতো। পরিপাটি সিঁথি কাটা। অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ে।)

শচীন। (অনুনয়ে নত হয়ে) আমাকে তুমি মাপ করো, শোভাদি। আমি তোমার সঙ্গে এত দিন এতক্ষণ যা করেছি সব অভিনয়। আমার সিনেমাতে প্লে করতে পারার রিহার্সেল। সিনেমায় নিজের যোগ্যতা দেখাবার জন্যে যতীশদার পরামর্শে নিয়েছিলুম ঐ প্রেমিকের পার্টটা। কিন্তু তুমিই বলো, আমি কি করতে পারি তোমার প্রেমিকের অভিনয়? পারি?

হিমানী। (বিমূঢ়) প্রেমিকের অভিনয়! এখানেও অভিনয়! আশ্চর্য, সমস্তটাই অবাস্তব নয় তো? এ কি, (যতীশকে দেখে) তুমি? তুমি বম্বে থেকে ফিরে এলে এরি মধ্যে? ধুতি, পাঞ্জাবি, চটিজুতো! পরিচিত পরিবেশে সেই পুরোনো শিথিলতা! সত্যি, কে জানে, আমিই এতক্ষণ অভিনয় করছিলুম কিনা। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার, শচীনবাবু। একদিন আসবেন আমার ওখানে, মিসেস সেনের চেয়ে আমার সঙ্গে ভালো জমবে আপনার প্রেমের অভিনয়। দুজনেরই মুখস্ত আছে পার্ট, রিহার্সেল দেওয়া আছে হালফিল, কিছু ভাববার নেই। আনবেন কখানা ঝলমলে শাড়ি, বম্বে যাবার দুখানা টিকিট, আর একটু অশ্রুগদগদ কণ্ঠস্বর। আসবেন। ভারি জমবে। হা হা হা। (স্খলিত পায়ে প্রস্থান)

শচীন। (বসলো শোভার পাশে। যতীশের প্রতি) আচ্ছা, অভিনয়টা কি আমার একেবারেই উৎরোয়নি?

যতীশ। দূর-দূর-দূর! তোমার আবার অভিনয়! স্ঁচ গড়তে জানে না, বন্দুকের বায়না নেয়। ইনি আবার নামবেন সিনেমায়। যত সব—

শচীন। আচ্ছা শোভা-দি, অভিনয় না-হয় আমার ভালো হয়নি,

কিন্তু তুমিই বলো, সমস্ত অভিনয় ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসেনি কি সত্যিকারের একটি সরল অন্তরঙ্গতার সুর? তুমি ধরতে পারোনি আমার সেই স্নেহের তন্ময়তা? কথাগুলিকেই তুমি বড়ো করে দেখো না, শোভাদি, সেই সুরটিও সন্ধান কোরো।

যতীশ। তুমি আর কেন! ফুরিয়ে গেছে তোমার পার্ট, পড়ে গেছে তোমার যবনিকা। এবার নিজের পথ দেখ।

শচীন। তাই দেখবো। যাবার আগে শোভাদির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে এসেছি। আর আমার সুটকেশ আর বিছানা—

শোভা। (শচীনের হাত ধরে) না, শচীন থাকবে আজ এখানে। ওর খাওয়া হয়নি কিচ্ছু। গল্প করা হয়নি ওর পুরী আর পুরীর চাকরি নিয়ে।

শচীন। মাঝখান থেকে আমিই জিতলুম, শোভাদি। কে কী তোমরা পেলে বা হারালে জানি না, কিন্তু আমি যা পেলুম তার তুলনা নেই। আচ্ছা শোভাদি, এটা কৃষ্ণপক্ষ?

শোভা। হ্যাঁ, কেন বলো তো।

শচীন। অনেক রাতে তা হলে চাঁদ উঠবে। চাঁদ ওঠা পর্যন্ত গল্প করবো আমরা ছাদে।

শোভা। বেশ তো!

শচীন। আর তুমি পরে আসবে সেই বকের পাখার মতো নতুন শাদা শাড়িটা—যে শাদা হচ্ছে অবিনশ্বরতার প্রতীক—উড়বে চুল, উড়বে আঁচল—উদাসীন তোমার ভঙ্গি--

শোভা। শচীন, আবার! (হেসে উঠলো)

শচীন। ও! (শচীনও হেসে উঠলো সশব্দে। যতীশ ঈষৎ নিচু হয়ে হাতের গহ্বরে পাইপ ধরাতে লাগলো।)

যবনিকা

নতুন তারা

পা ত্র - পা ত্রী

জয়ন্ত

নির্মল

প্রতিমা

সুধা

দোতলায় জয়ন্তের শুইবার ঘর। দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁসিয়া পিতলের একটা মজবুত খাট—তাহার উপর তকতকে বিছানা সদ্য পাতা হইয়াছে—পাশাপাশি শুইবার মতো স্থান ও বালিশ। খাটের সঙ্গে-ই দুইটি জানালা খোলা আছে—একটু বারান্দা এবং সামনেই পার্ক। বেশ প্রশস্ত ঘর—পূবে ও পশ্চিমে আরো দুইটি করিয়া জানালা—সবগুলিই খোলা। উত্তর দিকে নিচে নামিবার সিঁড়ি। উত্তর-পূব কোণে একটা কাচের আলমারি—বইয়ে ঠাসা; উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে একটু সরিয়া ভিতরের দিকে একটা ড্রেসিং-টেবিল এবং তাহারই সন্নিকটে একটি আলনা। টেবিল প্রসাধন-সামগ্রীতে ও আলনা কাপড়-ট্রাউজারে বোঝাই।

দক্ষিণের দেয়ালে একটা ক্লক—উত্তরের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিলেই নজরে পড়ে। ঘড়িতে চারটা প্রায় বাজে।

ছোট একটি লিখিবার টেবিল, দুইটি বেতের মোড়া ও একটি ইজিচেয়ারও আছে এদিকে-ওদিকে ছড়ানো।

যবনিকা উঠা-মাত্রই দেখা গেল প্রতিমা ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া—দুই হাতে দুইটা কাঁচের গ্লাশ লইয়া মিছরির পানা নাড়িতেছে—আয়নায় তাহার মুখের ছায়া। দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, বয়স ছাব্বিশ পার হইয়াছে—সীমন্তে সিন্দুর না থাকিলে আরো একটু কম বলিয়া মনে হইতে পারিত। পরনে আটপৌরে একখানি ফসা শাড়ি—কলাপাতার মতো সবুজ পাড়, গায়ে লংক্লথের সাধাসিধে ব্লাউজ, হাতায় বাহুর উপরে রঙিন সুতার কাজ করা। চুলগুলি ঘোমটার অন্তরাল হইতে বাঁধ বাহিয়া বুকে-পিঠে বিপর্যস্ত হইয়া আছে—খাটো চুল।

একটা কাঁচের গ্লাশে মিছরির জল রাখিয়া একটা বই দিয়া ঢাকিয়া প্রতিমা আয়নার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইল। এবার মুখ দেখা গিয়াছে, প্রতিমার গায়ের রঙ কালো—মিঠে-মিঠে কালো; মুখখানি লাবণ্যে মাখিয়া আছে। মুখের চেহারা একটু রোগা বলিয়া চক্ষু দুইটিকে বড়ো মনে হয়।

পিঠের উপর ঘোমটাটা ফেলিয়া দিয়া প্রতিমা চুলগুলিকে খোঁপা করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্য হাত তুলিয়াছে, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল। প্রতিমা একটু সচকিত হইয়া ঘড়ির দিকে তাকাইল। জুতার শব্দ অত্যন্ত লঘু, মন্থর। তবু জুতার শব্দকে পরিচিত ভাবিয়াই প্রতিমা আর পিছন ফিরিল না। সামনের পার্কে একটা ফিরিওয়ালা কতকগুলি ছেলেকে কাঠি-বরফ বিক্রি করিতেছে—তাহাই দেখিতেছে।

পিছনে অর্থাৎ উত্তরের দরজা দিয়া একটি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিল—নাম নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়—বয়স বত্রিশ। বেশভূষা পরিচ্ছন্ন হইলেও দামী নয়—নেহাৎই সাধারণ। চোখে-মুখে সপ্রতিভ ভাব, চাপা ঠোঁট দেখিলে ভদ্রলোকটিকে একটু কঠোরপ্রকৃতি বলিয়া মনে হয়। চুল উসকো-খুসকো, চেহারায় কি-রকম একটা রুক্ষতা আছে। ঘরে ঢুকিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া ধীরে-ধীরে প্রতিমার নিকটবর্তী হইতে লাগিল। প্রতিমার চোখ প্রায় টিপিয়া ধরে, এমনি সময় প্রতিমা পিছন ফিরিয়া নির্মলকে সহসা দেখিয়া ভীষণ চমকাইয়া উঠিয়া দুই হাত দূরে ছিটকাইয়া গেল। প্রতিমা রীতিমতো ভয় পাইয়া গেছে।

নির্মল। (অর্ধ-প্রসারিত দুই হাত তৎক্ষণাৎ গুটাইয়া নিয়া তাড়াতাড়ি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া) এই যে প্রতিমা, নমস্কার। বেশ ভালো আছো ?

প্রতিমা। (খাটের একটি ধার ধরিয়া—ভীত স্বরে) তুমি—আপনি কোত্থেকে এলেন ?

নির্মল। (অল্প একটু হাসিয়া) আপাতত মঙ্গলগ্রহ থেকে। চিনতে পাচ্ছ না ?

প্রতিমা। কিন্তু একদম সোজা ওপরে চলে আসবার কী মানে ?

নির্মল। মানে একটুও কঠিন নয়, একটু ভেবে দেখলে তুমিই বার করতে পারবে। আচ্ছা, নিচে বৈঠকখানায় এসে কার্ড পাঠালে তুমি নেমে গিয়ে দেখা করতে ?

প্রতিমা। তা পরে বিবেচনা করা যেত। কিন্তু না বলে-কয়ে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ির অন্তঃপুরে ঢুকে পড়া ভদ্রতা নয়।

নির্মল। একটু অভদ্র না হয় হলামই। এতে অত দুঃখিত হবার কী আছে ? নিচের ঘরও ঘর, এ-ও ঘর : নিচের ঘরেও লোক ছিল না, বেশ, এ ঘরেও লোক আসতে দিও না। হ্যাঁ, নিশ্চয়, তোমাদের বিছানাতে আমি বসছি না। (একটা বেতের মোড়ায় বসিল)

প্রতিমা। আপনার যদি তাঁর সঙ্গে কোনো দরকার থাকে, তবে

নিচে গিয়ে অপেক্ষা করুন। তিনি কোর্ট থেকে এক্ষুনি এসে পড়বেন। (ঘড়ির দিকে চাহিল)

নির্মল। জয়ন্তবাবুর ফী কত ?

প্রতিমা। জানি না।

নির্মল। তুমি একটু সুপারিশ করলে আমার একটা মোকদ্দমা উনি বিনা ফীতে করে দিতে পারেন। যদিও জানি শেষ পযন্ত আমারই হার হবে। তবুও দেখা যাক। তোমার তাঁকে একটু বলবে ?

প্রতিমা। কিসের মোকদ্দমা ?

নির্মল। এমনি মানুষের আইন-কানুন যে, তা নিয়ে মোকদ্দমাই চলে না। আজ যদি আমি তোমাকে নিয়ে এই পার্কের পার থেকে ম্যাডাগাসকারের দিকে পাড়ি দিই. আমাকে জেলে যেতে হবে ; আর জয়ন্তবাবু যে তোমাকে আমার চোখের সামনে দিয়ে দিব্যি তাঁর নিউ-মডেল ফিয়াট-গাড়িতে করে পালিয়ে নিয়ে গেলেন, তার জন্যে আদালতে একটা দরখাস্ত পর্যন্ত করা যাবে না। পেনাল কোডে এর জন্যে কোনো সেকশন নেই। থাকা উচিত, কি বলো প্রতিমা ? তোমরা যখন পুরুষের দয়ায় এম-এল-সি হতে পারবে তখন এ-বিষয়ে পেনাল কোডকে সংশোধন করবার জন্যে বক্তৃতা দিয়ো।

প্রতিমা। (বিরক্ত হইয়া) আপনার যে এত দূর অধঃপতন ঘটেছে তা আমি কোনো দিন ভাবিনি। ভদ্র মহিলাকে কী করে সম্বোধন করতে হয় তা পর্যন্ত আপনি জানেন না—

নির্মল। তোমার যে এতটা পদোন্নতি হবে তা কিন্তু আমি আগেই জানতাম, মিসেস সেন। তবে কি জানো, তোমাকে সাত বছর—সাত বছর আট মাস (আঙুলের কড় গুনিয়া একটু হিসাব করিয়া) প্রতিমা বলে ডেকেছি, নামটা যেন জিভে মেখে আছে। তুমিও তো আমাকে

দেখে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রথমে 'তুমি' বলে ডেকেছিলে—পরে জিভকে অবিশ্যি শাসন করলে। অভ্যাস প্রতিমা, অভ্যাস।

প্রতিমা। আপনি ককখনো ভদ্রলোক নন।

নির্মল। বোধ হয় মিথ্যা বলনি।

প্রতিমা। কোনো ভদ্রলোক এমনি করে অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকে পড়ে না। সে হয় চোর, নয় মাতাল।

নির্মল। কথাটা সত্য হত যদি তুমি আমার পরিচিতা না হতে। কত দিনের পরিচয়, মনে করতে পারো? খদ্দর বেচে জেলে গেলাম যে বছর, উনিশ শো কুড়ি সন—এটা সাতাশ! আমাকে তুমি চোর বলো আর মাতালই বলো, সত্যি কথা বলতে কি, তুমি জানো, আমি চোরও নই মাতালও নই।

প্রতিমা। কেন এসেছেন তাহলে?

নির্মল। এমনি!

প্রতিমা। তাই ঘরে ঢুকে আমাকে ছুঁতে হাত বাড়িয়েছিলেন—

নির্মল। তোমাকে নয়, তোমার চোখ দুটি ছোঁব ভেবেছিলাম—আর একটি বার। তোমাকে অমনি করে উদাসীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভারি লোভ হয়েছিলো—খুব অন্যায় হয়েছে?

প্রতিমা। (জোরের সঙ্গে) নিশ্চয়। আপনি এতদূর নষ্ট হয়েছেন যে সে সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান পর্যন্ত নেই। (কাকুতি করিয়া) আমার স্বামী এক্ষুনি এসে পড়বেন, দয়া করে এখান থেকে চলে যান।

নির্মল। (একটু হাসিয়া) আমার অধঃপতন যে কতদূর হয়েছে তা তুমি জানো না। বেশ তো তোমার স্বামী আসুন; শুনেছি তিনি নাকি খুব অতিথিপরায়ণ।

প্রতিমা। না, না, তা হবে না। আপনি যান।

নির্মল। ওপরে চলে আসবার সময় তো কারুর অনুমতি নেবার

দরকার বোধ করিনি—একটু না-হয় থেকেই গেলাম। গ্লাশে ও খাবার জল? খাব? (প্রতিমার অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়াই মিছরির পানা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। মুখ মুছিতে-মুছিতে) তুমি যে আমার চেয়ে তোমার স্বামীকে বেশি ভয় করো। তিনি তো চোরও নন, মাতালও নন।

প্রতিমা। আমি আপনার সঙ্গে বাজে কথা কয়ে সময় কাটাতে চাই না—আমার ঢের কাজ আছে। সামনেই দরজা—আপনি বেরিয়ে গেলে খুসি হব।

নির্মল। তোমার সুখের জন্য একদিন জীবন দিতে পারতাম, আজ সামান্য ক'টা সিঁড়ি ভাঙতে পারছি না বলে ক্ষমা কোরো। হাত বাড়িয়ে পাখা খুলে দাও না, শুধু শুধু এত ঘামছ কেন? জয়ন্তবাবু আসুন, তাঁর কাছে আমার একটা নালিশ আছে।

প্রতিমা। (ভয় পাইয়া) কী?

নির্মল। তিনি এলেই বলা যাবে।

প্রতিমা। না, বলুন।

নির্মল। তিনিই তার বিচার করবেন।

প্রতিমা। না, আপনাকে বলতেই হবে। আমার বিরুদ্ধে কিছু?

নির্মল। নইলে কি আমার বিরুদ্ধে?

প্রতিমা। (একটু উত্তেজিত) না, বলুন আপনি। আপনি আমার ঢের অনিষ্ট করেছেন, আমি আপনার কাছ থেকে আর অপমান সইবো না।

নির্মল। অনিষ্ট! অপমান! বলো কি?

প্রতিমা। আপনি জানেন না, আমার কি সর্বনাশ আপনি করেছেন!

নির্মল। সত্যিই জানি না।

প্রতিমা। আপনার পায়ে পড়ি, যদি আপনার মনুষ্যত্ব বলে কোনো জিনিস থাকে তবে এখান থেকে চলে যান।

নির্মল। মনুষ্যত্ব বলে কোনো পদার্থের আমি অধিকারী কি না জানি না, তবে গায়ে যে আমার ধুলো লেগে নেই তা বলতে পারি।

প্রতিমা। আপনার সর্বাঙ্গে ধুলো, আপনি যে কত মলিন তা-ও আপনি জানেন না।

নির্মল। জানলে আসতাম না—এই বলতে চাও?

প্রতিমা। কিছুই বলতে চাই না। খালি বলছি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে—আমার স্বামীর বাড়ি থেকে।

নির্মল। কথাটা সংশোধন করে ভালোই করেছো।

প্রতিমা। (চঞ্চল হইয়া) গেলেন না আপনি?

নির্মল। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? যদি-ও তুমি আগের চেয়ে আয়তনে একটু মোটা হয়েছো, বুদ্ধিও তোমার তদনুরূপ মোটা হয়েছে। জানো তো, আমি স্বদেশী যুগের ডাকাত,—যে-বাড়িতে ডাকাতি করতে যেতাম সে-বাড়ির মেয়েদের দিয়ে নারকোল কুরিয়ে মুড়ির মোয়া খেতে-খেতে ডাকাতি করতাম। আমার ভয় বলে কিছু নেই।

প্রতিমা। (ঘৃণার সহিত) লজ্জা বলেও কিছু নেই।

নির্মল। নেই। যে যত বেশি উজ্জ্বল, সে তত বেশি নির্লজ্জ। যেমন ধরো, সূর্য।

কিছুকালের জন্য বিশ্রী নিস্তব্ধতা—একটা গুমোট ভাব। প্রতিমা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া রাস্তাটা দেখিয়া নিয়া আবার আসিয়া দাঁড়াইল।

নির্মল। তোমার স্বামীর তো শুনেছি খুব ভালো প্র্যাকটিস। বাড়ি ফিরতে সাড়ে পাঁচটা হবে। ট্র্যামে আসেন? ও, না তোমাদের একখানা ফোর্ড আছে। সে-ফিয়াট-টা বেচে দিলে কেন?

প্রতিমা। (ফের ঘড়ির দিকে চাহিয়া) আপনি আর কতক্ষণ বসবেন?

নির্মল। বাকি জীবনটা নিশ্চয়ই নয়। বেশ নির্জন ঘর, রোদ পড়ে আসছে—আস্তে-আস্তে আকাশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠবে। খানিকক্ষণ বসে যেতে ইচ্ছে করছে।

প্রতিমা। বেশ, আপনি বসুন। আমার অনেক কাজ আছে, আমি-ই চললাম।

নির্মল। কি কাজ?

প্রতিমা। ওঁর জন্য এখনো জলখাবার তৈরি করা হয়নি।

নির্মল। বেশ তো, চলো না, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে রান্নাঘরে। দুজনে মিলে রাঁধিগে। একদিন এমনি সময়—তারো কিছু আগে হয়তো—তোমাদের ঝামাপুকুর লেনের বাড়ির রান্নাঘরে বসে আমরা দুজনে স্টোভ জ্বালিয়ে মোহনভোগ তৈরি করছিলাম। সে-ও এমনি ফাল্গুনের শেষাশেষি। তোমার তারিখ মনে আছে?

প্রতিমা। আমি তো আর সি-আই-ডি পক্ষের সাক্ষী নই যে সব তারিখ-টারিখ মুখস্থ থাকবে।

নির্মল। অর্থাৎ, তোমার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ নয়। নয় বলেই আমাকে যে 'তুমি' বলে ডাকা উচিত তাও ভুলে গেছ। আমার স্মৃতিশক্তি কিন্তু বেশ টনটনে আছে। তারিখটা হচ্ছে চৌঠা মার্চ, উনিশ শো পঁচিশ। মোহনভোগ করে একটা বাটিতে খাচ্ছিলাম আর পরস্পরকে খাইয়ে দিচ্ছিলাম। তুমি লজ্জায় হাঁ-ই করছিলে না। শেষে একবার তোমার গালে-মুখে খানিকটা মোহনভোগ মেখে দিয়েছিলাম, মনে আছে? তুমি জিভ্ বাড়িয়ে চেটে-চেটে খেয়েছিলে—

প্রতিমা। (ঠোঁটের প্রান্তে ক্ষীণ হাসিটি লুকাইবার চেষ্টা করিয়া) থাকুন আপনার স্মৃতিশক্তি নিয়ে। আমি চললাম নিচে। (চলিয়া যাইবার জন্য উত্তরের দরজার দিকে একটু অগ্রসর হইল)

নির্মল। তোমাকে এত সামনে দিয়ে যেতে দেখে যে তোমার আঁচল

চেপে ধরে বাধা দেবো সে অধিকারও আজ আমার নেই, ইচ্ছাও নেই। বেশ, (মোড়া হইতে উঠিয়া) আমি-ই যাচ্ছি। (সরাসরি ভাবে) কিন্তু যাবার আগে একটা কথা আমাকে জেনে যেতে হবে।

প্রতিমা। (থামিয়া, বিরক্তির সহিত) কী?

নির্মল। তোমার আমি কী অনিষ্ট করেছি—জেনে যেতে চাই।

প্রতিমা। (উত্তেজিত হইয়া) কী অনিষ্ট করেছেন! আপনি আমার নামে সব-জায়গায় দুর্নাম রটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

নির্মল। (ভুরু কুঁচকাইয়া) দুর্নাম!

প্রতিমা। হ্যাঁ। আপনি সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছেন যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন।

নির্মল। (ড্রেসিং-টেবিলে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া) ভালোবাসতাম, বলো। সে একটা দুর্নাম হ'ল? আমি যদি শুনি কেউ আমাকে ভালো-বাসত বলে কাব্যরচনা করছে বা কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিচ্ছে, আমি তাহলে তাকে দুমুঠো ভরে আকাশ এনে দিতাম।

প্রতিমা। কিন্তু এ-কথা প্রচার করে বেড়ানোর দরকার কি? তার মানে, কোনোদিন আমাকে আপনি ভালোবাসতেন না।

নির্মল। তুমিও তো তোমার স্বামী ও তাঁর আত্মীয়স্বজনকে বলে বেড়াচ্ছো যে আমাকে তুমি কোনো দিন ভালোবাসনি। তারে মানে কি এই যে তুমি আমাকে এই সাত বছর ধরে গভীর ভালোবেসে এসেছো?

প্রতিমা। এই ভাবে বলে বেড়ানোতে লাভ?

নির্মল। ক্ষতি?

প্রতিমা। ক্ষতি প্রচণ্ড। সে আপনি বুঝবেন না।

নির্মল। সম্পূর্ণ হয়তো বুঝবো না, কিছু-কিছু বুঝি। কিন্তু লাভও যে কত প্রচণ্ড তা তুমি একেবারেই বুঝবে না।

প্রতিমা। দরকার নেই বুঝে।

নির্মল। কিন্তু আমার বোঝানোতে অনেক লাভ আছে। একটা উপমা দেবার লোভ ছাড়তে পারলাম না। খানিক আগে সূর্যের কথা বলছিলাম, সেই সূর্য। তার আলোকে প্রকাশিত, উন্মুক্ত করে দেবার জন্যেই সূর্যের সার্থকতা। কোথায় অনাবৃষ্টি হল তা দেখবার তার সময় নেই।

প্রতিমা। কিন্তু সূর্য তো অস্ত গেছে। এখন তো অন্ধকার।

নির্মল। হ্যাঁ, জানি এখন অন্ধকার। রাত্রি। কিন্তু রাতেও যে পৃথিবীর আরেক পিঠে সূর্য থাকে, সে-কথা অস্বীকার করা চলে কী করে?

প্রতিমা। খুব চলে, সে-রাত্রির যদি অবসান না থাকে।

নির্মল। উপমাটা সার্থক হয়েছে। তুমি রাত্রি—অনবিচ্ছিন্ন নিবিড় রাত্রি। আমি সূর্য—চির জাগ্রত, প্রখর, প্রচুর। তোমার অন্ধকার দূর করতে আমার অভ্যুদয় হয়েছে। (সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) চিনতে পারবে, প্রতিমা?

প্রতিমা। অসম্ভব।

নির্মল। কি অসম্ভব? বলো, চুপ করে রইলে কেন?

প্রতিমা। আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক রাখা চলে না।

নির্মল। আমাকে ফের তা'লে বসতে হল। (মোড়ার উপর বসিয়া) তোমার সঙ্গে রীতিমতো তর্ক করতে হবে। কেন চলে না শুনি?

প্রতিমা। আপনি আমার সমস্ত বিশ্বাস হারিয়েছেন, মিথ্যা কথা প্রচার করে আমার স্বামীকে আমার প্রতি সন্দিগ্ধ করে তুলেছেন।

•নির্মল। তাই তোমার স্বামী এসে পড়ে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে ফেলেন বলেই বুঝি এত ঘাবড়াচ্ছিলে! কিন্তু কী মিথ্যা কথা আমি প্রচার করেছি বললে?

প্রতিমা। আমি আপনাকে নাকি বিয়ে করবো বলেই এত দিন ভালোবেসেছি—আমি বিশ্বাসঘাতক।

নির্মল। বেশ তো, না-হয় বিয়ে করবে না বলেই ভালোবেসেছিলে। তাতে কী হয়েছে! দোষটা কোনখানে?

প্রতিমা। যা-নয়-তাই বলে-বলে আমাকে লোকের কাছে কলঙ্কিনী করে তুলেছেন।

নির্মল। ভুল। গৌরবময় করে তুলেছি। মিথ্যা যদিও তোমার কিছু থাকে তা তোমার মুকুটমণি হয়েছে। শুনছি, তুমিও লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছো?

প্রতিমা। কী? বা-রে—কবে? কার কাছে?

নির্মল। বলে বেড়াচ্ছো যে, তুমি এত দিন আমাকে প্রেমের প্রশ্রয় দিচ্ছিলে কেননা আমি তোমার কাছে এত দিন কাকার মতো ছিলাম, না, মামার মতো।

প্রতিমা। সত্য কথাই তো বলেছি।

নির্মল। সত্য কথা বলোনি। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়। তুমি আমাকে যত চিঠি লিখেছিলে, ফের আরেকবার পড়ে দেখবে?

প্রতিমা। সে-চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলেন নি?

নির্মল। না।

প্রতিমা। (প্রায় কান্নার সুরে) কেন ছিঁড়ে ফেলেন নি! সব্বাইকে দেখাচ্ছেন?

নির্মল। সব্বাইকে নয়। ধরো আজ যদি আমাদের এক সঙ্গে দেখে জয়ন্তবাবু কিছু একটা সন্দেহ করে মোকদ্দমা করেন, তবে সে-চিঠিগুলি আমাকে আদালতে দাখিল করতে হবে।

প্রতিমা। আজকের দিনের কথা ভেবেই সেগুলি জমা করে রেখেছেন নাকি? আমার স্বামীকে অত ছোটলোক ভাববেন না। আপনার মতো পরনিন্দাই তাঁর পেশা নয়।

নির্মল। তুমি দান্তের নাম শুনেছো? বিয়াট্রিস? দান্তে ন বছর

বয়সে বিয়াট্রিসকে ভালোবেসেছিলো। সে ভালোবাসার কথা সে গোপন করতে পারেনি।

প্রতিমা। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন সত্যিকারের বিয়াট্রিসরা আঠারো বছর বয়সেই মরে।

নির্মল। তুমিও যদি আঠারো বছরেই মরতে, তোমার যখন বিয়ে হয়নি—তা'লে আমিও হয়তো দান্তের মতো মহাকবি হতাম, তবে জানো কি, আমি মিথ্যাচারীকে সহজে ক্ষমা করবার মতো দুর্বল হ'তে শিখিনি।

প্রতিমা। তাই অভদ্র হয়ে পৌরুষ দেখাচ্ছেন! এখন আপনি যান—আমার কী সর্বনাশ করেছেন তা তো জানলেন।

নির্মল। তোমার স্বামী তোমাকে সন্দেহ করেন,—আর ?

প্রতিমা। করতেন।

নির্মল। কি করে সে-সন্দেহ দূর করলে ?

প্রতিমা। সত্য কথা বলে।

নির্মল। তবে আমাকে সত্য কথা বলতে দেবে না কেন ? আসুন তোমার স্বামী। তাঁকে আমার সত্য স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবো। ভয় পাবে না তো ?

প্রতিমা। কিসের ভয় ? বলবো, আপনি আমার বন্ধু ছিলেন।

নির্মল। (উল্লাসে) বন্ধু! ছিলাম কেন, আছি, আজো আছি! দেখলে তো—কত সহজ সমাধান। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই বলছিলে না ? আছে। বন্ধু আমরা। বোস আমার পাশে—এই মোড়াটায়।

প্রতিমা। আপনি বসুন, আমি কাজ সেরে আসি।

নির্মল। এবার সত্যিই তোমার আঁচল চেপে ধরে বাধা দেবার সাহস হচ্ছে। তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার সে-চিঠিগুলি ছিঁড়ে ফেলেছি বৈ কি! পকেটে করে নিয়ে আসিনি।

প্রতিমা। কিই বা ছিল তাতে ?

নির্মল। মনে নেই, তবে তোমাকে ভয় পাইয়ে দেবার মতো জিনিস ছিল হয়তো। বেশ, আমরা বন্ধু। সম্পর্কটাকে অনেক সহজ করে আনা গেছে। কিন্তু, এক দিন তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলে—সেই উনিশ শো ছাব্বিশের মে-মাস—দারুণ বৃষ্টি হচ্ছিলো, আমি আর তুমি নৌকোতে করে নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলাম—সেদিনের কথা তুমি তোমার স্বামীকে বলো নি কেন? তেমন আরেকটা দিন কি তোমার জীবনে আসবে? ডুববো ঠিক—সেই ভেবে দুজনে হাতে হাত জড়িয়ে বাইরে এসে ঝড় দেখছিলাম, তুমি আমাকে কানে-কানে বলেছিলে ঃ আমাকে অনাস্বাদিত মৃত্যুর মতো সুমধুর একটি চুম্বন দাও। এমন মজা প্রতিমা, তোমার ঠোট এসে আমার ঠোটে ডুবলো, কিন্তু নৌকো ডুবলো না।

প্রতিমা। সে-সব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

নির্মল। কথাটাকে বন্ধুর মতো করে বলো ঃ সে সব এখন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তোমার সে বিলেত পালিয়ে যাওয়ার আইডিয়ার কথা মনে আছে ?

প্রতিমা। একটু-একটু। শেষকালে ব্যাপারটা কেমন বেরিয়ে পড়লো।

নির্মল। তোমার বোকামির জন্যে।

প্রতিমা। আমার বোকামি কিসে ?

নির্মল। তুমি কেন বোকার মতো পাসপোর্টটা পড়ার টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছিলে ?

প্রতিমা। (অন্তরঙ্গতার সহিত) সত্যি, যদি ধরা না পড়তাম।

নির্মল। তা'লে য়্যাদ্দিনে আমরা ভেনিসে এসে নীড় বেঁধেছি! তা'লে, তুমি আমাকে এমনি করে তাড়িয়ে দিতে পারতে না।

প্রতিমা। (অল্প একটুখানি আগাইয়া আসিয়া) সে-সব দিনগুলি

আমার সহজে ঘুম আসতো না—জেগে-জেগে নীল ফেনিল বিশাল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতাম। সত্যিকারের সমুদ্র যা নয় তার চেয়েও বড়ো করে সে-সমুদ্রের ছবি আঁকতাম। সে-সমুদ্রের চেয়েও আমার হৃদয়কে বড়ো মনে হত। তুমি গেলে না কেন ?

নির্মল। এক-একা আর যেতে ইচ্ছে করলো না। (হঠাৎ) তুমি যাবে ? চলো, বেরিয়ে পড়ি। অনেক দূরে, যেখানে আমাদের অতীতকালকে ফেলে এসেছি।

প্রতিমা। পেছনে আর চলা যায় না। আমরা ভুলতে পারি বলেই বাড়তে পারি।

নির্মল। হারাতে পারি মানেই ঐশ্বর্যশালী ছিলাম।

প্রতিমা। কিন্তু সে-হারাবার কথাকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়ানোর দীনতা আমাকে লজ্জা দেয়।

নির্মল। আমাকে দেয় তৃপ্তি। যে-তুমি সবার কাছে এত সাধারণ, এত অপ্রয়োজনীয়, সেই তোমাকে হারিয়ে যদি আমি ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠি, তা'লে তোমার মূল্য তুমিই ঠিক করো।

প্রতিমা। তুমি আই-সি-এস দিয়েছিলে ?

নির্মল। দিয়েছিলাম, ফেল করেছি।

প্রতিমা। কেন ফেল করলে ?

নির্মল। তুমি কেন আমাকে বিয়ে করলে না ?

প্রতিমা। (হাসিয়া) তাহলে পাশ করতে পারতে ?

নির্মল। (হাসিয়া) হয়তো পারতাম না। কিন্তু পাশ করলে তোমাকে বিয়ে করতে পাবো জানলে নিশ্চয়ই পাশ করতাম।

প্রতিমা। বিয়ে করতে পেলে না বলে এখন কী করছো ?

নির্মল। চাকরি।

প্রতিমা। কোথায় ?

নির্মল। কাশীতে—

প্রতিমা। কতো মাইনে পাও?

নির্মল। জিগগেস না করলেই পারতে। পঁয়ষট্টি টাকা। আশা করি, এর পর বিয়ে করেছি কি না জিগগেস করবে না।

প্রতিমা। গেল-পূজোয় কাশীতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গার ঘাটগুলিকে কী চমৎকার দেখায় বলো তো। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভারি চমৎকার হত।

নির্মল। চিনতে পারতে?

প্রতিমা। না, তা কি আব পারতাম? (অন্য মোড়াটায় বসিয়া) নতুন যে জায়গায়ই গেছি, ভেবেছি দূর থেকে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

নির্মল। দূর থেকে।

প্রতিমা। কাছে এলেই ভয় করবে, তুমি যে ডাকাত!

নির্মল। তোমার মতো নয়। দেখা হলে কী হত?

প্রতিমা। একটুখানি মনখারাপ হত। মাঝে-মাঝে মনখারাপ হলে বেশ ভালো লাগে!

নির্মল। কাশীতে তুমি একলা গেছলে? মানে—

প্রতিমা। হ্যাঁ, একলাই গিয়েছিলাম। কাশীতে তুমি যদি কাছে আসতে তাহলে ভয় পেতাম না। নৌকো করে গঙ্গায় বেড়াতে যেতাম।

নির্মল। কিন্তু ঝড় উঠতো না।

প্রতিমা। না-ই বা উঠতো! এমন ঠাণ্ডা নদী তুমি দেখেছ—এমন মিষ্টি জল! (হাঁটুর উপর দুই কনুইয়ের ভর রাখিয়া একটু নিচু হইয়া) আমি জলে পা ডুবিয়ে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করতাম। নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে খুব ভালো লাগে, না?

নির্মল। আমার ঝড় ভালো লাগে।

প্রতিমা। আচ্ছা, নারায়ণগঞ্জের সেই ঝড়ে যদি আমাদের নৌকো ডুবে যেত?

নির্মল। ডুবে যেত।

প্রতিমা। মরে যেতাম তো নিশ্চয়ই। আচ্ছা, মরলে কী হয়?

নির্মল। তুমি-ই বলো।

প্রতিমা। ধরো, দুজনে একটা নক্ষত্রলোকে বেড়াতে যেতাম। মঙ্গলগ্রহে নয়—এমন একটা তারা যা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।

নির্মল। সেখানে গিয়ে দুজনে আবার স্টোভ জ্বালিয়ে মোহনভোগ রাঁধতাম।

প্রতিমা। সেখানে হয়তো খিদে পেত না। পৃথিবীর সব নিয়মই সেখানে খাটবে এমন কি কথা আছে?

নির্মল। আমরা যাচ্ছি তো পৃথিবী থেকে।

প্রতিমা। গেলামই বা। সেখানে যে আমরা নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবো! তোমার মা কেমন আছেন?

নির্মল। গেল-বছর পুজোর সময় মারা গেছেন।

প্রতিমা। (আহত হইয়া) মারা গেছেন? তাঁর অসুখের কথা আমাকে জানাও নি যে!

নির্মল। জানালে কী হত?

প্রতিমা। তাঁকে আরেকবার দেখতাম, সেবা করতাম। আমার কথা তাঁর মনে ছিল?

নির্মল। (সহসা, প্রতিমাকে ধীরে একটু স্পর্শ করিয়া) চোখ বোজ!

প্রতিমা। কেন?

নির্মল। একবার দুজনে চোখ বুজে ফের চোখ মেললেই হয়তো দেখতে পাব এই ঘরটা সেই নতুন তারা হয়ে গেছে।

প্রতিমা। আচ্ছা, উনি যদি এখন এসে পড়েন?

নির্মল। তখন আবার এই তারা তোমার স্বামীর শোবার ঘর হয়ে যাবে।

প্রতিমা। কি বলবো তাঁকে?

নির্মল। ভালোবাসার সময় তুজনই যথেষ্ট, কিন্তু বিয়ের পর পরিচয়টা আড়াল করবার জন্যে আরেকজনের দরকার আছে। বলবে, ইনি আমার সেই বন্ধু!

প্রতিমা। তাঁর সঙ্গে কিন্তু ডাকাতের মতো ব্যবহার কোরো না। মক্কেলদের মতো বেশ সমীহ করে কথা কোয়ো। আমার জন্যে অন্তত।

নির্মল। তিনি ভদ্রলোক হলেই বাঁচি।

প্রতিমা। তুমি তো এখন চলে গেলেও পারো।

নির্মল। বা, তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে যাবো না?

প্রতিমা। বৈঠকখানাতে গিয়ে ততক্ষণ বোস না, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নির্মল। (কঠোর হইয়া) চা আমি খাই না।

প্রতিমা। তোমার চেহারা খুব কাহিল হয়ে গেছে। বিয়ে করলেই তো পারো।

নির্মল। বিয়ে করলেই চেহারা ভালো হয় না কি?

প্রতিমা। আচ্ছা, তখন যে বড়ো শাসিয়েছিলে, কী নালিশ করতে তাঁর কাছে?

নির্মল। বলতাম, প্রতিমা ভারি দুষ্টু হয়েছে।

প্রতিমা। সত্যিই, তোমার বিয়ে করা উচিত। ভুলে যাবার পক্ষে বিয়ে-করার মতো টনিক আর নেই।

নির্মল। নিজেকে দেখে জেনেরালাইজ কোরো না।

প্রতিমা। না, আমিই তো একমাত্র সে-নিয়মের ব্যতিক্রম। তোমাকে আজো ভুলিনি।

নির্মল। গোড়াতেই তো তার চমৎকার পরিচয় দিয়েছ।

প্রতিমা। সত্যিই, আজো আমি সেই নতুন তারার স্বপ্ন দেখি—তারাটা শাদা বরফে ঢাকা, গাছ নেই, প থর নেই, বাতাস নেই। নিরেট নীরব তারা।

নির্মল। (প্রতিমার একখানি হাত ধরিয়া) যাবে সেখানে ? (এমন সময় সিঁড়িতে চটিজুতার শব্দ স্পষ্টতর হইতে লাগিল।)

প্রতিমা। (নির্মলের হাত ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া) উনি আসছেন—কি হবে ?

নির্মল। (তেমনি বসিয়া থাকিয়া) আসতে দাও। কা আবার হবে ?

প্রতিমা দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। জুতার শব্দ ঘরের খুব কাছে আসিতেই নির্মল চট করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বইয়ের আলমারির পিছনে গিয়া লুকাইল। ক্ষণকালের জন্য পিছন ফিরিয়া এই ব্যাপারটা দেখিয়া নিমেষে প্রাতমার মুখ নিদারুণ ভয়ে পাংশু হইয়া গেল।

জয়ন্তর প্রবেশ। বয়স বত্রিশ হইবে, মাথার সামনে অল্প একটু টাক—গোঁফ আছে। সাটিনের ট্রাউজার্স, তার উপর আলপাকার চাপকান, গলায় কোণমোড়া কলার—কড়া করিয়া ইস্ত্রি-করা। নিচে 'শূ' ছাড়িয়া মোজা-শুদ্ধই চটিজুতা পরিয়া আসিয়াছে।

জয়ন্ত। (পকেট হইতে একটা পোস্টকার্ড বাহির করিয়া) মহা মুস্কিলে পড়া গেছে। সুধার চিঠি এসেছে দেখ।

প্রতিমা। কার ? সুধা-ঠাকুরঝির ?

জয়ন্ত। হ্যাঁ। ঠিকানা ভুল লিখেছে, তাই ঠিক সময় পৌঁছয়নি। কোর্টে বিকেলবেলা পেলাম।

প্রতিমা। (উদ্বিগ্ন স্বরে) কী লিখেছে ?

জয়ন্ত। (চিঠিটা টেবিলের উপর রাখিয়া চাপকানের বোতাম খুলিতে-খুলিতে) আজ সকালবেলা ঢাকা-মেইলে কলকাতা পৌঁছেছে নাকি। স্টেশনে থাকতে লিখেছিলো। দেখ তো কী কাণ্ড—চিঠির ঠিকানা লিখতে ভুল, পাঁচটা পোস্টাপিস ঘুরে হাতে এলো।

প্রতিমা। কার সঙ্গে আসছে লেখেনি?

জয়ন্ত। (চিঠিটা তুলিয়া নিয়া) এই যে আমরা রওনা হব। বোধ হয় স্বামীর সঙ্গে আসছে।

প্রতিমা। তা হলে আর ভাবনা কি?

জয়ন্ত। ওর স্বামীর হয়তো কলকাতায় তেমন আত্মীয়স্বজন নেই, তাই আমাদের এখানেই উঠতে চেয়েছিলো। খুব অন্যায় হয়ে গেল কিন্তু।

প্রতিমা। তাতে তোমার হাত কি! চিঠি ঠিক সময় না পেলে কী করতে পারো?

জয়ন্ত। তবু জানো তো ওর বাবা—আমার ছোট মামাবাবু আমাকে মানুষ করেছেন। ছোট মামাবাবু এলাহাবাদে ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন—সেখানেই 'ল' পড়া ও পাশ করা। সেই ছোট মামাবাবু হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস হয়ে মারা গেলেন। রাত্ দশটায় খেয়ে-দেয়ে শুয়েছেন, একটুও টুঁ-টাঁ না করে ধীরে-ধীরে নেমে গেলেন। সুধা আমাদের কত আদরের বোন—কত দিন দেখিনি।

প্রতিমা। বিয়ের সময় তো যেতে পারনি।

জয়ন্ত। (চাপকানটা খুলিয়া ফেলিয়া—নিচে টুইলের শার্ট) কী করেই বা যাব? দরিয়াপুরের মোকদ্দমাটা পেলাম—দিনে বত্রিশ টাকা ফী। আমার মতো নতুন উকিলের পক্ষে একটি দিনও কামাই করা চলতো না।

প্রতিমা। তারপর তো একদিনও আদরের বোনটির তত্ত্ব-তালাস করোনি।

জয়ন্ত। সে সব তো তোমার দেখবার কথা। সে সব বিষয়ে কি তোমার হুঁস আছে? দুখানা বাজে নভেল পড়তে পেলেই খুসি! এখন বলো তো আমি ওদের কোথায় খুঁজি!

প্রতিমা। ওরা নিজেরাই খুঁজে আসবেখন।

জয়ন্ত। (কলারের বোতাম খুলিতে-খুলিতে) ঠিকানাই জানে না—কত হয়তো ঘুরতে হবে।

প্রতিমা। ওর স্বামী নিশ্চয়ই আর গণ্ডমূর্খ নয়—এমন একটা বিখ্যাত উকিলের বাসা চিনতে পারবে না। "হরিশ চ্যাটার্জি"তে গেলেই "হরিশ মুখার্জির" পাত্তা মিলবে।

জয়ন্ত। কিম্বা ওর স্বামী গোঁয়ারগোবিন্দও হতে পারে। হয়তো স্টেশনে আমাকে না দেখে রাগ করে কোনো হোটেলে গিয়ে উঠেছে।

প্রতিমা। সুধা-ঠাকুরঝির বিয়েটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। নিজেই স্বয়ম্বরা হয়েছিলো বুঝি।

জয়ন্ত। শুনতে পাই তো। স্বামী নাকি বাউণ্ডুলে।

প্রতিমা। প্রেম অন্ধ।

জয়ন্ত। চোখের জল ফেলে-ফেলে বুঝি?

প্রতিমা। না, অসহ্য দীপ্তিতে। (থামিয়া) তুমি জামা-কাপড় ছেড়ে নিচে এসো, খাবার এখনও তৈরি হয়নি।

জয়ন্ত। (হঠাৎ রাগ করিয়া) কেন তৈরি হয়নি? কী করছিলে এতক্ষণ? একি, মিছরির সরবৎও করনি।

প্রতিমা। একটা বই পড়ছিলাম—

জয়ন্ত। তার জন্যে তুমি আমার খাবার তৈরি করে রাখবে না! আমার কী ভীষণ খিদে পেয়েছে, জানো? দশ হাত কাপড় পরতে জানলেও কাছা দিতে তো আর শেখনি। জানো পা ছড়িয়ে বসে গিলতে। মাথার ঘাম তো আর পায়ে ফেলতে হয় না।

প্রতিমা। অমন চেঁচিয়ো না, দুমিনিটে হয়ে যাবে।

জয়ন্ত। দুমিনিটের খাবার আমি খাই না।

প্রতিমা। বেশ, দুঘণ্টাই না হয় লাগাবো।

জয়ন্ত। আমার এমন খিদে পেয়েছে যে তোমার ঠাট্টা ভালো

লাগছে না। তুমি কেন আমার কাজে এত গাফিলি করো? কবিতা লিখছিলে বুঝি?

প্রতিমা। কবিতা লিখতে বসলে তোমার এই গোঁফ জোড়া মনে করে আমার এত হাসি পায়—লেখা আর হয় না। তুমি বোস, আমি নিয়ে আসছি। (চলিয়া যাইতে পা বাড়াইল। সহসা আলমারির পিছন হইতে নির্মলের আবির্ভাব।)

নির্মল। যেয়ো না, প্রতিমা। (জয়ন্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিল। প্রতিমার ভয় ও অস্থিরতা) সত্য কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলে কেন? ঠিকই তো, কবিতা রচনা করছিলে।

জয়ন্ত! (কঠোর স্বরে প্রতিমার প্রতি) কে এ?

নির্মল। বলো না, আমার বন্ধু, যে-বন্ধু প্রেমের নগ্নতায় একটি অন্তরাল রচনা করে—আমার নতুন তারার বন্ধু।

জয়ন্ত। (আরও কঠিন স্বরে) লুকিয়ে এ-সব কী কাণ্ড হচ্ছিলো?

নির্মল। আমাকে মাপ করো প্রতিমা, বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকা গেল না, আলমারির পেছনে ডজন-খানেক আরশুলা জামার ভেতরে ঢুকে ভারি ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো। (জয়ন্তের প্রতি) চায়নায় আরশুলা চালান দিতে পারেন। সে-ব্যবসায় লাভ হতে পারে।

জয়ন্ত। (নির্মলের প্রতি) কে আপনি? কেন এখানে এসেছেন?

নির্মল। ঠিক জেরার মতো হচ্ছে না, জয়ন্তবাবু। এক 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' বলে পার পাওয়া যাবে না।

জয়ন্ত। (প্রতিমার প্রতি) উত্তর দাও, কে এ?

প্রতিমা। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু—বহু দিন পরে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন। দুজনে বসে গল্প করছিলাম, তুমি ঘরে আসতে না আসতেই হঠাৎ উনি আলমারির পেছনে গিয়ে লুকোলেন।

জয়ন্ত। কেন লুকোলেন?

নির্মল। শুনেছিলাম আপনি নাকি ভীষণ পালোয়ান। তাই ভয় পেয়ে লুকিয়েছিলাম। রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স্।

জয়ন্ত। তাই এতক্ষণ আমার খাবার তৈরি হয়নি?

নির্মল। আমাকে মাপ করবেন জয়ন্তবাবু, এত তেস্টা পেয়েছিলো যে আপনার মিছরির সরবৎটুকুও খেয়ে ফেলেছি।

জয়ন্ত। (প্রতিমার প্রতি) এই নষ্টামি কতদিন থেকে চলছে?

প্রতিমা। (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমার কি দোষ! যদি একজন অভদ্রের মতো ভদ্রলোকের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে আমি তাকে ঠেকাই কি করে?

নির্মল। তা ছাড়া আমি স্বদেশী যুগে ডাকাতি করতাম।

প্রতিমা। আমার সঙ্গে ছেলেবেলায় আলাপ ছিল। একেবারে তাড়িয়েও দিতে পারি না—তাড়িয়ে দিলেও শুনতো না—লোকটা এমন পিশাচ।

নির্মল। 'ছেলেবেলা' ডিফাইন করো।

জয়ন্ত। (নির্মলকে ধমক দিয়া) চুপ করো।

প্রতিমা। (আগের কথার পারম্পর্য রাখিয়া) তোমাকে দেখে যে আলমারির পেছনে গিয়ে লুকোবে—আর মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা যে বিসদৃশ ও বিশ্রী করে দেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

জয়ন্ত। আমি ঘরে ঢোকা মাত্রই আলমারির পেছনে যে লোক আছে তা বলোনি কেন?

নির্মল। তার জন্যে আপনার স্ত্রীর কিছুমাত্র দোষ নেই,—দোষ রশুলার। উনি ভেবেছিলেন যে আপনি হাতমুখ ধুতে নিচে নেমে গেলেই আমি তিরোধান করবো। কিন্তু অভদ্র আরশুলাগুলোর জন্যে সব জানাজানি হয়ে গেল।

জয়ন্ত। (প্রতিমার প্রতি) তবে যে বলছিলে পড়ছিলে?

নির্মল। স্বামীর কাছে অমন দুচারটে মিথ্যে কথা স্ত্রীরা বলেই থাকেন।

জয়ন্ত। আমার সঙ্গে কত দিন ধরে এই মিথ্যা ব্যবহার করছ?

নির্মল। বন্ধুর অসাক্ষাতে স্ত্রীকে বকবেন।

জয়ন্ত। উত্তর দাও।

প্রতিমা। তোমার সঙ্গে আমি কোনো মিথ্যা ব্যবহার করিনি। আমাকে অসহায় পেয়ে ঐ লোকটা আমাকে অপমানিত করছে। আমি তোমারই কাছে বিচার প্রার্থনা করছি।

জয়ন্ত। (নির্মলের প্রতি) আপনি ভদ্রলোক?

নির্মল। হ্যাঁ, এবার আমাকে বকুন। স্ত্রীকে বকে কোনো পৌরুষ নেই। ভদ্রলোক? যদি বলি, ভদ্রলোক, আপনি বিশ্বাস করবেন?

জয়ন্ত। কখনো না। ভদ্রলোকের বাড়ির ভিতরে ঢুকে এমন ইতরামো কদিন থেকে করছেন?

নির্মল। আজ।

জয়ন্ত। জানেন আপনাকে আমি পুলিশে দিতে পারি?

প্রতিমা। তাই দাও—এই পাষণ্ডের জেল খাটাই উচিত। পশু!

নির্মল। পুলিশে দিতে পারেন, তবে আপনি বিচক্ষণ উকিল বলে দেবেন না।

জয়ন্ত। বিচক্ষণ উকিল! তুমি কী ভাবছ? চাকরবাকর ডাকিয়ে তোমাকে ছাতু করে দিতে পারি, জানো?

নির্মল। তা-ও জানি, কিন্তু তা-ও আপনি করবেন না।

জয়ন্ত। তা-আমি করবো না! (প্রতিমার প্রতি) ডাকো তো রঘুয়াকে—

প্রতিমা। রঘুয়া! রঘুয়া!

নির্মল। (মোড়ার উপর বসিয়া জামার ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে)

আগে আপনার রঘুয়াকে দেখি, পরে পালাবো কিনা বিবেচনা করা যাবে।

জয়ন্ত। বসলে যে! (মোড়াতে লাথি মারিয়া) আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

নির্মল। রঘুয়া আসুক।

জয়ন্ত। না, রঘুয়া আসবে না।

নির্মল। তবুও আমাকে একটু বসতে হবে। (প্রতিমার প্রতি) তুমি যাও না নিচে, খাবার তৈরি করোগে, আমার জন্যেও কোরো— আমারো কম খিদে পায়নি। সুইচটা টেনে দাও, বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। এখুনি তারা ফুটবে! নিচে যদি রঘুয়াকে পাও, পাঠিয়ে দিয়ো।

জয়ন্ত। ছোটলোক কোথাকার, যাবে কি না বলো।

নির্মল। বললাম তো, আমাকে এখানে একটু বসে থাকতে হবে। একজনের প্রতীক্ষা করছি।

জয়ন্ত। কার?

নির্মল। (একটু হাসিয়া) রঘুয়ার। রঘুয়াকে ডেকে আনো না!

জয়ন্ত। রঘুয়াকে কেন?

নির্মল। আমার মাথা ফাটাতে নয়। ওকে এক টুকরো কাগজে একটা ঠিকানা লিখে পাঠালে বাড়ি চিনে যেতে পারবে?

প্রতিমা। আপনি ডাকাতি করতে এসেছেন নাকি? চিঠি পাঠিয়ে বন্ধুদের ডেকে আনতে চান? (স্বামীর প্রতি) তুমি লালবাজারে এক্ষুনি ফোন করে দাও।

নির্মল। (প্রতিমার কথার সুর অনুকরণ করে) দাও ফোন করে। তোমার লালবাজারই আসুন আর শ্যামবাজারই আসুন, আমি উঠছিনে। আগুনে জাহাজ পুড়ে গেলেও আমি ক্যাসাবিয়ানকার মতো ঠায় বসে থাকবো। প্রতীক্ষা কাকে বলে, শিখে রাখো প্রতিমা।

জয়ন্ত। (আগাইয়া আসিয়া) আপনার নাম?

নির্মল। নাম বললেও চিনতে পারবেন না। আইন নামক প্রেয়সীটি শুনেছি অত্যন্ত হিংসাপরায়ণা—ভক্তকে আর কোথাও দৃষ্টিপাত করতে দেয় না। আমার নাম তোমার মনে আছে, প্রতিমা ?

জয়ন্ত। আমার স্ত্রীকে নাম ধরে সম্বোধন করছেন যে ?

প্রতিমা। আস্পর্ধা !

নির্মল। প্রতিমা নামটি শুনতে আপনার ভালো লাগে না ? আপনি তো আশা করি ব্রাহ্ম নন। আমারই মতো প্রতিমা-পূজো করেন।

জয়ন্ত। তোমার মতলব কি, স্পষ্ট করে বলো।

প্রতিমা। আমাকে অপমানিত করতে, তোমার কাছে আমাকে কলুষিত করে দেখাতে।

জয়ন্ত। বলো, কেন এসেছ ?

নির্মল। সে-ই বুঝে বিহ্বিত করবেন ? আমার মতলব একেবারেই ঘোরালো নয়—মিণ্ট-থেকে-বেরিয়ে-আসা নতুন টাকার মতোই ঝকঝকে। কেন এসেছি ? কারণটা তুমিই সত্যি করে বলো না, মিসেস সেন।

প্রতিমা। আপনি একটা ঘৃণ্য কীটের চেয়েও অধম—তাই তার স্বামীর সামনে নারীকে অপমান করতে আপনার কুণ্ঠা আসে না। ভাবছেন এমনি ছল করে খুব বাহাদুরি হচ্ছে ! (স্বামীর প্রতি) তুমি একে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। যা হবার তা হবে।

নির্মল। চটলে তোমাকে আর আগের মতো সুন্দর দেখায় না।

জয়ন্ত। বলবে না ?

নির্মল। চটবেন না, বলছি। আলোটা জ্বালুন।

(জয়ন্ত সুইচ টিপিয়া আলোটা জ্বালাইয়া দিল)

নির্মল। কেন এসেছি ? প্রতিমার সঙ্গে আলাপ করতে—কত দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

জয়ন্ত। (কি একটা আবিষ্কার করিয়া) ও! আপনি এঁকে বুঝি ভালোবাসতেন?

নির্মল। ঠিক মনে নেই। তবে যাঁকে ভালোবাসতাম তিনি ইনি নন।

জয়ন্ত। (বিরক্ত হইয়া) তবে কিনি?

নির্মল। (হাসিয়া) মনে নেই।

প্রতিমা। আলাপ তো শেষ হয়েছে, এখন আপনি যান।

নির্মল। যাচ্ছি; আর একটু। (যেন আপন মনে) বড্ড দেরি করছে। (সহসা) আপনি ল অফ আইডেন্টিটিতে বিশ্বাস করেন? তাতে বলে: সক্রেটিস সব সময়েই সক্রেটিস: এক তার অর্থ। আমি বিশ্বাস করি না। আজকের প্রতিমা আর সাত বছর আগের প্রতিমা সমান নয়।

প্রতিমা। নিশ্চয়ই নয়।

জয়ন্ত। আলমারির পাশে লুকিয়ে ছিলেন কেন?

প্রতিমা। চোরের মতো?

নির্মল। হ্যাঁ, বীরের মতো নয় বটে। লুকিয়েছিলাম কেন ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবো না। কেন জানি মাথায় এলো।

প্রতিমা। এই মাথা চাকার তলায় পিষে ফেলা উচিত।

নির্মল। তার জন্যে তোমার মাথা-ব্যথা না করলেও চলবে। মোট কথা—

জয়ন্ত। (দৃঢ়স্বরে) মোট কথা?

নির্মল। মতলব ছিল প্রতিমাকে ভয় পাইয়ে দেব।

জয়ন্ত। প্রতিমার প্রতি এই করুণা!

নির্মল। করুণা নয়, নির্দয়তা তা আমি বুঝি। তার কারণ ছিল।

জয়ন্ত। কি কারণ?

নির্মল। যে-আমাকে ও দীর্ঘ সাত বছর ধরে ভালোবেসে এসেছে তাকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ওর ভয় কেন? কেন ওর মুখ অপরাধীর মুখের মতো চুন হয়ে এসেছিলো?

প্রতিমা। ভয়? তোমাকে ভয়?

নির্মল। আমাকে নয়, তোমার স্বামীকে।

প্রতিমা। কেন আমার স্বামীকে ভয় করবো?

নির্মল। হ্যাঁ, কেন ভয় করবে? একদিন যাকে ভালো লেগেছিলো তাকে চিরকালই ভালোবাসতে হবে এর যেমন মানে নেই, তেমনি একদিন যে ভালো লেগেছিলো তা স্বীকার করতে লজ্জিত হবারো কোনো মানে নেই।

প্রতিমা। তোমাকে আমি কোনোদিন ভালোবাসিনি।

নির্মল। (পকেট হাতড়াইয়া) একটা চিঠি বোধহয় সঙ্গে আছে। দেখি।

প্রতিমা। (ব্যাকুল কণ্ঠে স্বামীর প্রতি) তুমি ওর কথা একটিও বিশ্বাস কোরো না। ও জালিয়াত, ডাকাত—একবার জেল খেটেছিলো ছমাস; ও সব করতে পারে।

নির্মল। (পকেট খুঁজিয়া) না, নেই। ব্যস্ত হয়ো না।

প্রতিমা। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) যা হয়নি, তা কখনো থাকে?

নির্মল। যা থাকে না, তা কখনো হয়?

জয়ন্ত। কি বলতে চান আপনি?

নির্মল। হ্যাঁ, যা বলতে চাই। বলতে চাই যে অতীত কালে আমি ওর—

জয়ন্ত। (বাধা দিয়া) অতীত মৃত।

নির্মল। মৃত বলেই তো বেশি সুন্দর, বিস্মৃত বলেই তো তা বেশি রমণীয়। নয়?

প্রতিমা। যার প্রাণ নেই তার সৌন্দর্য কোথায়?

নির্মল। সৌন্দর্য না থাক, সৌরভ আছে। যে বন্ধু ছেড়ে যায় তার বন্ধুতারই দাম বেশি।

জয়ন্ত। (মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে) থাক তার দাম। আপনি এখন দয়া করে এ-স্থান ত্যাগ করুন। আমার মাথা ঘুরছে, কোর্ট থেকে ভারি শ্রান্ত হয়ে এসেছি, এখনো মুখ-হাত ধুইনি। কিছু খেতে হবে।

নির্মল। (প্রতিমার দিকে চাহিয়া) এ-যুগের পতিভক্তির নমুনা দেখুন। তুমি যাও না নিচে, স্বামীর জন্য জলখাবার তৈরি করো গে।

জয়ন্ত। আপনি যান।

নির্মল। বেশ তো, আপনি জামা কাপড় ছাড়ুন, মুখ হাত ধোন। প্রতিমা যাচ্ছে খাবার করতে। যদি হয়, আমাকে এক পেয়ালা চা দিও।

জয়ন্ত। (বিরক্ত হইয়া) আমরা চা খাই না।

নির্মল। তবে আরেক গ্লাশ মিছরির সরবৎ দাও।

প্রতিমা। ঘরে মিছরি নেই।

জয়ন্ত। আপনি যদি এখন না যান, তবে সত্যিই আমি পুলিশ-স্টেশনে ফোন করবো।

নির্মল। (যেন আপন মনে) সত্যিই, এত দেরি করছে কেন? (জয়ন্তের প্রতি) রঘুয়াকে একটু ডেকে দিন না; এই গলির মোড়ের হলদে বাড়িতে একটা চিঠি দিয়ে আসবে।

প্রতিমা। আপনার চোখ নেই, না পা নেই, যে আপনি সেই হলদে বাড়িতে যেতে পাচ্ছেন না?

নির্মল। সময় নেই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়া সুধার প্রবেশ। সুধা—বয়েস সতেরো আঠারো হইবে—পাতলা ছিপছিপে—ঝর্ণার মতো চঞ্চল। পরনে খুব ফিকে বেগুনী রঙের একখানা বেনারসী শাড়ি, বর্ষাকালে সূর্য উঠিবার আগে মেঘলা আকাশের মতো সর্বাঙ্গ হইতে আনন্দ বিচ্ছুরিত হইতেছে।

সুধা। (দুয়ারে প্রতিমাকে প্রথম দেখিয়া) এই যে বৌদি! চিনতে পারছো?

জয়ন্ত। আরে, তুই। একা নাকি? কখন এলি?

সুধা। সকালে এসেছি, স্টেশনে ছিলে না কেন?

জয়ন্ত। কি ভুল ঠিকানা লিখেছিস! কোথায় উঠেছিস?

সুধা। (হাসিয়া) তারো ঠিকানা জানি না। (প্রতিমার প্রতি) চিনতে পাচ্ছো না?

প্রতিমা। পাচ্ছি না আবার! আমার বিয়ের সময় দেখেছিলাম—

সুধা। আমার বিয়ের সময় তো তোমাকে দেখলাম না।

নির্মল। গন্ধর্ব-বিয়েতে নোটিশ দেবার প্রথা নেই।

জয়ন্ত। এখন কোত্থেকে আসছিস?

প্রতিমা। সঙ্গে বডি-গার্ড আসেনি? লজ্জায় নিচে দাঁড়িয়ে আছে বুঝি? (জয়ন্তের প্রতি) যাও, অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে এসো গে।

নির্মল। উপরে তা'লে অনেক লোক হয়ে যাবে।

জয়ন্ত। সুধাকে এ-ঘর থেকে নিয়ে যাও।

সুধা। দাঁড়াও, তোমাকে প্রণাম করি। (বলিয়া নিচু হইয়া আগে প্রতিমাকে ও পরে জয়ন্তকে প্রণাম করিল। (নির্মলের কাছে আসিয়া) তুমিও পা দুটো বাড়িয়ে দেবে নাকি? (সুধা ফের নিচু হইতেই জয়ন্ত তাহার হাত খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল।)

জয়ন্ত। (তাড়াতাড়ি) ও আমাদের কেউ নয়। ওকে প্রণাম করতে হবে না। (প্রতিমার প্রতি) ওকে ঐ ঘরে নিয়ে যাও না!

(প্রতিমা সুধাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আকর্ষণ করিল)

সুধা। (ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া) কেন, এই ঘরেই তো সবাই বেশ আছি। (প্রতিমার প্রতি) তোমাদের এই গলির মোড়ে হলদে বাড়িটাতে মালতী থাকে—আমার এলাহাবাদের সই। এগোতে দেখি নিচের ঘরের রোয়াকে বসে মালতী মেমদের বাক্সওয়ালার কাছ থেকে মেয়ের জন্যে ফ্রক কিনছে। ওকে এমন জায়গায় দেখতে পাবো স্বপ্নেও ভাবিনি। অভাবনীয়রূপে ওকে দেখতে পেয়ে কী চমৎকার যে লাগলো।

নির্মল। এতদিন পরে প্রতিমাকে দেখে আমার যেমন লেগেছিল!

জয়ন্ত। আঃ, ওকে যাও না নিয়ে।

প্রতিমা। যেতে না চাইলে আমি কী করবো।

জয়ন্ত। সুধা! পাশের ঘরে যা তো।

সুধা। যাচ্ছি। মালতী কি আমাকে সহজে ছাড়ে? দুহাত ভরে যেন আকাশ পেয়েছে।

নির্মল। এই উপমাটা আমার।

সুধা। নইলে, ভবানীপুর এসেছি তো কতক্ষণ হল। বললাম, দাদার বাড়ি বেড়াতে এসেছি। ও বললে যাবি্খন বাত্রে। খানিক থেকে যা। খাইয়ে দাইয়ে তবে ছাড়লে। কত গল্প যে করলাম! তাইতেই দেরি হয়ে গেল।

প্রতিমা। এলে কার সঙ্গে?

নির্মল। মেয়েরা আজকাল ভোট পেয়েছে, নাচতে শিখেছে, গলির মোড়টুকু থেকে পায়ে হেঁটে দাদার বাড়ি আসতে পারে না?

জয়ন্ত। (নির্মলকে ধমক দিয়া) চুপ করো।

সুধা। তোমাদের দেখে আমার কী যে ভালো লাগছে, বৌদি। আমি কয়েকদিন থেকে যাবো এখানে।

নির্মল। রিটার্ন-টিকিটের মেয়াদ কত দিন?

জয়ন্ত। সে-খবরে তোমার কি বাপু?

নির্মল। তোমাদের বাড়িতে রেডিয়ো আছে, প্রতিমা?

জয়ন্ত। (কর্কশ স্বরে) ফের কথা কয়?

নির্মল। রেডিয়ো থাকলে এই চ্যাটর্‌বক্‌স্‌ মেয়েটিকে ঘণ্টা তিনেকের জন্য চুপ করিয়ে রাখতে পারবেন। যা বকে—

সুধা। বকবো না, একশো বার বকবো।

জয়ন্ত। এর সঙ্গে কথা কয় না, সুধা। পাশের ঘরে যা, আমি জামা-কাপড় ছেড়ে যাচ্ছি।

প্রতিমা। এসো।

সুধা। যাচ্ছি। তোমাদের বাড়ি খুঁজে নিতে আমাদের অযথা কি বেগ পেতে হলো। এমন লোকের সঙ্গে এসেছি যে রাস্তা বের করতেই এক ঘণ্টা। রোদ্দুরে আমার কম হায়রানিটা হয়েছে! তারপর মালতীর সঙ্গে দেখা—এমন আশ্চর্য দেখা খুব কম ঘটে। মালতী চমৎকার মেয়ে। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। চলো না, ওকে নেমন্তন্ন করে আসি।

নির্মল। তাই যাও।

জয়ন্ত। না। তুমি হুকুম দেবার কে হে?

নির্মল। বলছিলেন না ওকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে!

সুধা। এক্ষুনি যাচ্ছি না।

নির্মল। যেয়ো না।

প্রতিমা। (সুধাকে) লোকটা ভারি বাচাল।

সুধা। অত্যন্ত।

জয়ন্ত। কার সঙ্গে এলি ঢাকা থেকে? একা?

নির্মল। পাগল!

সুধা। কার সঙ্গে আবার! (নির্মলকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া) ঐ যে বসে আছে—

জয়ন্ত। ঐ বাঁদরটার সঙ্গে?

নির্মল। দেখলে সুধা, তোমার এবার রীতিমতো অপমান বোধ করা উচিত। স্বামীর সামনে নারীকে অপমান করতে এদের কুণ্ঠা আসে না।

সুধা। তুমি এতক্ষণ তোমার নিজের পরিচয় দাওনি?

নির্মল। দিয়েছি—একেবারে হুবহু। আমি চোর, মাতাল, জালিয়াৎ, ছোটলোক—হ্যাঁ, প্রেমিক—তোমার ফিরিস্তিটা বলে-বলে যাও, প্রতিমা! খালি অতীতকালের সম্বন্ধটা বলা হয় নি। তা-ও আর উহ্য রইলো না।

সুধা। অতীতকালের সম্বন্ধ মানে?

নির্মল। বন্য পূর্বপুরুষদের কালটা তো অতীত কাল-ই।

প্রতিমা। (চমকিত) তুমি বিয়ে করেছ?

জয়ন্ত। সুধাকে!

নির্মল। খবরটা শুনে বিস্মিত না ব্যথিত বোধ করছ, প্রতিমা!

প্রতিমা। (কথার সুর স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করিয়া) এতে আমার দুঃখ কিসের?

নির্মল। বা, তোমার প্রেমের স্মৃতির প্রতি অপমান! এতে তোমার বেশি অপমানিত মনে করা উচিত। সুধার দিকে তাকাচ্ছ কি? সুধা সব জানে। সুধাকে আমি সব বলেছি। বলবার মধ্যে সত্য ছিল বলে সাহস ছিল।

সুধা। (ঠোঁট উলটাইয়া) এ আমি কিছুই বুঝছি না।

নির্মল। (দাঁড়াইয়া) এ-ও বলেছি, যে-প্রেম আমি ফেলে এসেছি

সেই প্রেম আমার বিস্তীর্ণ আকাশ হয়ে থাক, বেদনায় নীল, ভাবে গম্ভীর। সুধার সঙ্গে আমার পথের প্রেম, পৃথিবীর প্রেম !

সুধা। আমি অত-শত কবিত্ব বুঝি না। কি হলো তোমার ?

নির্মল। (জয়ন্তের প্রতি) সুধাকে পাশের ঘরে গিয়ে নিরাপদ হতে বলছিলেন না? চলো সুধা, এ-বাড়ির আর পাশের ঘরে নয়, এ বাড়ির বাইরে—রাস্তায়।

জয়ন্ত। (আগাইয়া আসিয়া নির্মলের কাঁধে হাত রাখিয়া আদরের স্বরে) তাই। তুমি সুধার স্বামী বলেই তো ঠাকুরজামাই হয়ে আলমারির পেছনে লুকিয়ে ঠাট্টা করছিলে! এ-রকম ঠাট্টা চলে। তোমাকে বাঁদর বলেছি বলে রাগ করো না, নির্মল! (হাসিয়া) কপি থেকেই ত কবি।

নির্মল। আর, উল্লুক থেকেই তো উকিল।

জয়ন্ত। যা পোশাক—কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়।

নির্মল। (সুধাকে) চলে এসো। (ঘড়ির দিকে চাহিয়া) সময় নেই আর।

সুধা। বা, এখুনি যাবো কি।

নির্মল। যাবে না তো, সতী সাজবে নাকি ?

সুধা। সতী সাজবো মানে ?

নির্মল। বিয়ের পর সব মেয়েই একেকটি তৈলপক্ক সতী সাজে, তার কথা বলছি না। সতী মানে দক্ষকন্যা।

সুধা। সে এখানে কি ?

নির্মল। বলা যায় না, হয়ে যেতে পারো চট করে। মেয়েদের কি, যখন যেমন সুবিধে, একটা কিছু হয়ে পড়লেই হলো।

জয়ন্ত। কেন আর রাগ করছো, নির্মল ?

নির্মল। রাগ আমি করবো কেন ? রাগ করবে সুধা। জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয় যাবে। স্বামীর নিন্দা স্বামীর অপমান সে সহ্য করবে না।

মুহূর্তে মহাপ্রলয় সুরু হয়ে যাবে। আর মাঝখান থেকে আমিই বিপদে পড়বো। দরকার নেই, চলে এসো, সুধা।

জয়ন্ত। কিছুই বিপদ নয়। শোনো।

নির্মল। ভীষণ বিপদ। কাঁধে আর আমার জায়গাও নেই, জোরও নেই। একটা মৃতদেহ এত দিন বহন করে-করে পঙ্গু, অসাড় হয়ে গেছে। (সুধার হাত ধরে) চলে এসো। এখুনি।

সুধা। (আশ্চর্য) কোথায় যাব?

নির্মল। (দোরের কাছে আসিয়া) কোথায়! সেই মৃতদেহেরই কথার পুনরাবৃত্তি করছি। এক নতুন তারার দেশে—শাদা বরফে ঢাকা, গাছ নেই, পাথর নেই, বাতাস নেই। নিরেট নীরব তারা! দাঁড়িয়ে দেখছ কি? (গম্ভীর স্বরে) এসো।

সুধা একটিও কথা কহিল না। নির্মলের আহ্বানে অভিভূত হইয়া গেল তাহার অনুগমন করিতে বাধা হইল। সিঁড়িতে দুই জনের মন্থর পদশব্দ ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেল। রঙ্গমঞ্চে এক মিনিটব্যাপী পূর্ণ নিস্তব্ধতা—কঠিন ও ক্লান্তিকর।

জয়ন্ত। (শার্টটা খুলিতে-খুলিতে) ওগো, শুনছ?

প্রতিমা। (চমকিত) যাই, তোমার খাবার তৈরি করি গে।

যবনিকা

যে করে হোক্

পা ত্র - পা ত্রী

হৃষীকেশ—গভর্নমেণ্ট পেনসনার, ৫৫

ইরা—মেয়ে, ৩২

নীরেন—ছেলে, ২৯

অনতি—গৃহ-শিক্ষয়িত্রী, ২৩

বেলা তিনটে-চারটের মাঝামাঝি। দোতলায় ইরার বসবার-শোবার ঘর। দু' দরজাওয়ালা। উত্তরে বারান্দা, এক পাশ ঘেঁসে নিচে নামবার সিঁড়ি। ঘরের ভিতরে খাট, আলনা, ড্রেসিংটেবিল, ইজিচেয়ার, এমনি-চেয়ার, লেখবার টেবিল, বইয়ের তাক, কাঁচের দরজা-দেয়া আলমারি, আর যা-যা চলতে পারে, ইরা আর তার বারো বছরের মেয়ের পক্ষে। ইরার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ, বিধবা, আলস্যে-ডোবানো শরীর। গলায় সোনার সরু সুতলি, হাতে চুড়ি দু'গাছা ক'রে, ডান হাতের অনামিকায় হীরের আংটি। গায়ে আর কিছু না থাক, বেশ একটা নগদ টাকার ভাব আছে। যার থেকে আসে শান্তি, দৃঢ়তা, সংযম। যার জোরে বাপের বাড়িতে বসে ভাসুর-দেওরদের সঙ্গে পার্টিশনের মোকদ্দমা চালানো যায়।

সম্প্রতি একটু ঘুমিয়ে পড়েছে ইরা, আধখানা ইজিচেয়ারে, বুকের উপর ছড়িয়ে রয়েছে একটা বৃহদাকার 'পূজাসংখ্যা'।

একটু ত্রস্ত পায়ে ঘরে ঢুকলো অনতি। বয়স তেইশ-চব্বিশ, রূপ না থাকলেও ঝিলিক আছে। যা প্রায় অভাবনীয়, বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের আভাস ভেসে ওঠে চোখে। পায়ে-পায়ে সব সময়েই পালাই-পালাই ভাব, ভুরু দুটো যেন বিরক্তি দিয়ে আঁকা, নাকের কাছটায় সব সময়েই একটা অস্বস্তি। কিন্তু তার এখনকার আবির্ভাবটা অন্যধরনের। বেশ স্পষ্ট, গম্ভীর, একটু বা কর্কশ।

অনতি। (ইরার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে) ইরা-দি! (ইরা নিঃসাড়) ইরা-দি! (তবুও নিশ্চুপ) শুনছ? শুনছ ইরা-দি? (গায়ে ঠেলা মারলো)

ইরা। (চমকে উঠে) কে? (চিনতে পেরে) বাবাঃ, যা চমকে উঠেছিলুম—(আবার চোখ বুজলো)

অনতি। আমার মতো চমকান নি। শুনুন।

ইরা। (চোখ না খুলে) কি?

অনতি। আমি চললুম।

ইরা। (চোখ না খুলেই) কোথায়? সিনেমায়? রুচি ফিরেছে ইস্কুল থেকে?

অনতি। না। ওর তো আজ দেরি হবে ফিরতে।

ইরা। (ওরি মধ্যে একটু পাশ নিয়ে) ওকে ফেলে রেখে গেলে ও ভীষণ চটবে তোমার উপর।

অনতি। সিনেমায় যাচ্ছি না, ইরা-দি। আপনাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

ইরা। (এবার চোখ মেললো) কী বলছ ?

অনতি। আপনার মেয়ের মাস্টারি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি।

ইরা। তার মানে ?

অনতি। আমার এখানে আর পোষাবে না।

ইরা। হঠাৎ ? এতদিন পরে ?

অনতি। আরো আগে আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল। তাই মনে হচ্ছে এখন।

ইরা। কেন, মাইনে কম এখানে ?

অনতি। মাইনের কথা ভাবিনি কোনো দিন।

ইরা। তবে ? মেয়েটা কথা শোনে না ?

অনতি। রুচি কথা শুনবে না কেন ?

ইরা। তবে চলে যাচ্ছ কী রকম ? (মৃদু হাস্য) কে কী অপরাধ করলো ?

অনতি। ভীষণ অপরাধ।

ইরা। অপরাধ ! সে কী !

অনতি। হ্যাঁ, অপমান। অপমান ছাড়া তাকে আর কিছু বলে না।

ইরা। অপমান ! কী বলছ তুমি ? কে অপমান করলো ? (অনতি চুপ) চাকর-বাকররা কেউ কিছু বলেছে ?

অনতি। ওরা বলবে ওদের সাধ্য কী।

ইরা। তবে নীরেন কিছু বলেছে ?

অনতি। তিনি কোথায়? তিনি তো এখন আপিসে।

ইরা। ঘটনাটা তা হ'লে সন্থ-সন্থ ঘটেছে?

অনতি। এক্ষুনি। দশ মিনিটও হয়নি।

ইরা। তবে, (যেন নিজের মনে) আমি কিছু বলেছি?

অনতি। আপনি তো ঘুমিয়ে।

ইরা। তবে? আর কে তোমাকে তবে অপমান করলো? (অনতি চুপ) এ কী, চুপ করে গেলে কেন? বলো।

অনতি। আপনার বাবা।

ইরা। বাবা? (দাড়িয়ে পড়লো)

অনতি। হ্যা, আপনার বাবা, হৃষীকেশবাবু। গভর্নমেণ্ট-পেনসনার। সন্থ রিটায়ার করে যিনি গীতা-উপনিষদ না পড়ে হ্যাভলক এলিস পড়ছেন।

ইরা। কী বলেছেন তিনি?

অনতি। কিছু বলেন নি—

ইরা। কিছু বলেন নি! তার মানে? (অনতি চুপ) কী করেছেন?

অনতি। গায়ে হাত দিয়েছেন।

ইরা। কী বলছ তুমি?

অনতি। যখন বলতে পারছি তখন সত্য কথাই বলছি। ঘুমিয়ে ছিলুম খাটের উপর, দরজা ভেজানো ছিল। দরজা খুলে ঢোকবার সময় জাগিনি—বুঝুন তবে, কী সন্তর্পণে, চোরের মতন তিনি ঢুকেছেন। কতক্ষণ ছিলেন দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে, কে জানে। যখন জাগলুম, দেখলুম, আমার গায়ের উপর তাঁর হাত।"

ইরা। তুমি ঠিক দেখেছ? ভুল হয়নি তোমার?

অনতি। ভুল হবে! ভুল হবে কেন? আমি চিনি না আপনার

বাবাকে ? তিন মাসের উপর আমি এ-বাড়ি আছি, দিন-রাত্রের মাস্টার, আর আমি খোদ বাড়ির কর্তাকেই ভুল করবো ?

ইরা। তবু, বাবা এমন কাজ করবেন সহজে বিশ্বাস করতে পারছি না।

অনতি। বরং আমি মিথ্যে কথা বলছি বিশ্বাস করা সহজ। নিজের স্বামীর সম্বন্ধেই মেয়েরা বিশ্বাস করতে চায় না, আর এ তো আরো উপরে —বাপ! পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ—

ইরা। তুমি আমার বাবাকে ভালো করে চেননি, অনু।

অনতি। যেটুকু চিনেছি এ ক'দিনে, মনে হয়েছে তিনি ফের তাঁর স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

ইরা। কী যে বলো তার ঠিক নেই।

অনতি। কেন, খুব অসম্ভব বলে মনে হয ? আপনার মা মারা গেছেন কবে ?

ইরা। প্রায় বারো বছর হলো। এই বারো বছর ধরে বাবা সবত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁকে তুমি দেখনি তো আগে—

অনতি। তখন নিশ্চয়ই আমি অনেক ছোট ছিলুম। দেখলেও মাহাত্ম্য ঠিক বুঝতে পারতুম না। কিম্বা, তিনিই বুঝতেন না আমার মাহাত্ম্য।

ইরা। তখন্ তাঁর বয়েসই বা কত! এই বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। সে একটা কী বয়েস অমন বলবান, স্বাস্থ্যবান লোকের পক্ষে। ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারতেন আরেকটা। কত ঝোলাঝুলি, কত সাধাসাধি, উস্কে দেবার লোকের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু বাবা টলেন নি এক চুলও।

অনতি। স্ত্রীর প্রতি তৃষ্ণা বারো বছরেই তামাদি হয়ে যায় না, ইরা-দি।

ইরা। তা জানি না। কিন্তু জানি আমরা আমাদের বাবাকে।

অনতি। কী জানেন শুনি?

ইরা। নৃশংস রকম সংযত। ভোগস্পৃহার লেশমাত্র নেই। এত উপার্জন করেও এক বিন্দু বিলাসিতা করেন নি কোনো দিন। রিক্ত, শক্ত পাহাড়ের মতো জীবন কাটিয়েছেন।

অনতি। মার্জনা করবেন, ইরা-দি। ঐ রিক্ততার সত্যিকারের ব্যাখ্যা হচ্ছে, উনি নির্জলা কৃপণ, কঞ্জুস। অপব্যয় করবার মহত্ত্ব তাঁর শেখা নেই।

ইরা। তামাক দূরের কথা সামান্য পান খাননি কোনোদিন। কলেজে পড়তে এক দিন সিগারেট খেয়েছিলো বলে নীরেন কী মারটাই খেয়েছিলো তা আমি মরে গেলেও ভুলতে পারবো না।

অনতি। ঐ একই ব্যাখ্যা, ইরা-দি। তামাক পোড়াতে হলে টাকাও পোড়াতে হয়।

ইরা। আর তাঁর সুনীতি কী নিশ্ছিদ্র ছিল! বিয়ের আগে আমার নামে খামের চিঠি একটাও আস্ত পাইনি। নীরেনের চুল ছাঁটবার সময় নাপিতের সামনে বসে থাকতেন তিনি মোড়া পেতে। ছাদে যদি কখনো একা যেতুম, কিম্বা বাড়ি ফিরতে নীরেনের যদি কোনো দিন সন্ধে হয়ে যেত, ধরা পড়লে রক্ষে থাকতো না। চুপচাপ কিছু পড়ছি দেখলেই সিদ্ধান্ত করতেন উপন্যাস পড়ছি। আর সেটা যদি দৈবাৎ উপন্যাসই হতো, তবে সেটা যারই বই হোক, নির্ভাবনায় তিনি তা পুড়িয়ে ফেলতেন। আমাদের উপর নির্বিরোধ প্রহারটাই পর্যাপ্ত শাসন বলে মনে করতে পারতেন না।

অনতি। আপনারা তবে পড়তেন কী?

ইরা। বিজ্ঞান। বলতেন শুধু, বিজ্ঞান পড়ো।

অনতি। ঠিকই বলতেন। হ্যাভলক এলিসও বিজ্ঞান। চরম বিজ্ঞান।

ইরা। কী কড়া পাহারা তাঁর, পাছে যক্ষ্মার জীবাণুর মতো প্রেম ঢুকে পড়ে আমাদের ফুসফুসের মধ্যে। দেহের ক্ষয় হলেই যক্ষ্মা, নীতির ক্ষয় হলেই প্রেম। একবার এক মামাতো বোনের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড় যাচ্ছিলুম, শ্যামবাজারে, ট্র্যামে করে। মামাতো বোনের দেওর ট্র্যামে আমার পাশে বসে ছিল, যেটুকু জায়গা, স্বভাবতই গা ছুঁয়ে। ফিরতি ট্র্যামে বাবা দেখে ফেলেছিলেন সেই ঘেঁসাঘেঁসিটা। শুধু সেই অপরাধে বাবা সেই ভদ্রলোককে বাড়িতে আর ঢুকতে দেননি। আর, তারি পরেই বোধ হয় অনেক লেখালেখি করে ট্র্যামে 'লেডিজ সিট'-এর প্রবর্তন করেছেন। তারপর নীরেনের কথা যদি শোনো—

অনতি। রুচি নেই। ওতে আরো বুঝতে পেরেছি আপনার বাবাকে।

ইরা। অমিত্রাক্ষর ছন্দে থিয়েটারের কি-একটা পার্টের মহড়া দিচ্ছিল সে—অত্যন্ত গদ্‌গদ ভাষায়, স্বরটা যথাসম্ভব মিহি করে। হয় সীতা নয় মন্দোদরার পার্ট। বাবা শুনতে পেলেন চতুর্থ ঘর থেকে। খেলাচ্ছলে আবৃত্তি করছে জেনেও বাবা তাকে রেহাই দিলেন না, হেম বাঁড়ুয্যের বৃত্রসংহার কাব্যের তিন-তিনটে সর্গ মুখস্ত করিয়ে ছাড়লেন।

অনতি। এ সব আপনারা সইতেন কেন?

ইরা। সইতুম, নিঃশব্দে সইতুম, তাঁর বীর্যবান ব্যক্তিত্বের জন্য। যতই তিনি কড়া আর গোঁড়া হোন, তাঁর মধ্যে এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। তাঁর নিষ্ঠুরতার পবিত্রতাটাই আমাদের মুগ্ধ করতো। মুখ তুলতে পারতুম না। নইলে, ভাবতে পারো, প্রায় ত্রিশের কাছে বয়স হতে চললো, নীরেনের এখনো বিয়ে হয় না কেন?

অনতি। অনায়াসেই পারি। নিশ্চয়ই অনেক টাকা চান।

ইরা। তা তো চানই। আর খুতির মুখ খুলে অনেক আণ্ডিলই তো বসে আছে।

অনতি। তবে হচ্ছে না কেন?

ইরা। মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না।

অনতি। কার? নীরেনবাবুর?

ইরা। তার তো সব মেয়েই পছন্দ। সে বলে যেখানে প্রেম নেই, সেখানে আবার তর-তম কী। মেয়ে মেয়েই। এই নিয়মে তার কাছে পাচিও পাচ্য, খেঁদিও খাদ্য। আর, এমনি মজা, যখন অক্লেশেই সে পছন্দ করে বসে, বাবাও অক্লেশেই ভেবে বসেন, নিশ্চয়ই প্রেম আছে আগে থেকে। জিলিপির ফেরে চলে আজকাল ছেলে-মেয়েরা।

অনতি। প্রেম বুঝি উনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

ইরা। দু' চক্ষেও না। ঐ যে বাইবেলের বাঙলা বিজ্ঞাপন বেরোয়, 'ঈশ্বরকে প্রেম করো' বা 'যীশুখৃস্ট যে প্রেম করিলেন' তা দেখেও তাঁর রাগ হয়, লজ্জা করে।

অনতি। লজ্জা করে না শুধু ঘুমন্ত প্রেম দেখতে, দোর ঠেলে পরের ঘরে চুপিচুপি ঢুকে পড়ে।

ইরা। এই আমাদের বাবা, নিয়ম আর শাসনের প্রতীক, কাঠিন্য আর সংযমের, তিনি এমন একটা যা-তা কাণ্ড করে বসবেন এ চট করে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে, অনু।

অনতি। তার চেয়ে, আমি যখন মাস্টারনী, তখন আমিই যা-তা, তাই ভেবে নেয়া অনেক বেশি স্বস্তিকর। মাস্টারনী সম্বন্ধে এই যদি আপনাদের ধারণা, তবে ঘটা করে মাস্টারনী চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কেন?

ইরা। বা, মিসট্রেস রাখা তো বাবারই পরামর্শে। পুরুষ-মাস্টার রুচিকে পড়াবে এতে তো বাবার প্রায় মূর্ছা যাবার দাখিল। আর উড়ো মাস্টারনীও তাঁর পছন্দ নয়—

অনতি। প্রায় ঠিকে ঝির মতো। কিম্বা দিনের কাজ সেরে রাত্তিরে যে নিজের ঘরে শুতে যায় তেমনি ঝি।

ইরা। দিনে-রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টা যে বাড়িতে থেকে পড়াতে পারবে তেমন শিক্ষয়িত্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন দিলেন। যার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারবেন। যাকে রাখতে পারবেন তাঁর চোখে-চোখে, নিয়মের লোহার লাইনের উপর খাঁজ কেটে বসিয়ে দেবেন যার চলার চাকা।

অনতি। জিলিপির ফেরে আজকালকার ছেলে-মেয়েরাই চলে না ইরা-দি, চলে তাদের সেকেলে বাপ-ঠাকুরদারাও। হৃষীকেশবাবুর তা হলে বরাবরই ইচ্ছে যে মাস্টারনী এসে তাঁকে 'ত্বয়া হৃষীকেশেন হৃদিস্থিতেন' বলে বুকের উপর তুলে নেয়—

ইরা। বলেছি তো, বিশ্বাস হয় না। তোমার উপর তাঁর ধারণা তো বরাবরই উঁচু। তুমি যে খেলো, ঠুনকো নও, এ-কথা কত দিন বলেছেন।

অনতি। এত দয়া!

ইরা। হ্যা, এ বাড়িতে এসে তুমি যে নীরেনের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করনি, আলাপ জমানো দূরের কথা, একটাও কথা বলনি তার সঙ্গে, তার কৌতূহলকে যে প্রশ্রয় দাওনি এতটুকুও, তাতে তো তিনি তোমাকে কত প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, খাঁটি মেয়ে। টকবে না কোনো দিন।

অনতি। ও! তাঁর তবে গোড়া থেকেই লক্ষ্য, আমাকে গ্রাস করবেন সম্পূর্ণ। আস্তে-আস্তে সুড়ং খুঁড়ছিলেন তাই।

যেন কাছেই কোথায় ছিলেন এমনি দ্রুত ও আকস্মিক প্রবেশ করলেন হৃষীকেশবাবু।
বয়সে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, মজবুত শরীর, মাথার চুলে যদিও পাক ধরেছে।
হাতকাটা শার্টের উপর পাতলা র‍্যাপার। মুখ-চোখের ভাবটা
অস্থির, যত না রেগেছেন, ঘাবড়েছেন বেশি।

হৃষীকেশ। (ইরাকে) বিদেয় করে দে, বিদেয় করে দে। কত পাওনা আছে মাইনে বাবদ, হিসেব করে বিদেয় করে দে এক্ষুনি।

অনতি। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেবে না? নিদেন, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে?

হৃষীকেশ। এটা যে ভদ্রলোকের বাড়ি সেটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি বোঝো তাই আমি চাই।

অনতি। ও! ভদ্রলোকের বাড়ি! সেই ভদ্রলোক কি আপনি?

হৃষীকেশ। তোমার কী মনে হয়?

অনতি। সেই ভদ্রলোক যদি আপনি হন, তবে আমি যাব না।

হৃষীকেশ। যাবে না?

অনতি। না। যতক্ষণ না আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করছেন। আপনার মেয়ের সামনে স্বীকার করছেন।

হৃষীকেশ। অপরাধ!

অনতি। একেবারে আকাশ থেকে পড়ছেন যে! কেন, দুপুরবেলা আমার ঘরে ঢোকেননি আপনি দরজা ঠেলে?

হৃষীকেশ। (তাচ্ছিল্য সহকারে) দুপুরবেলা!

অনতি। হ্যাঁ, রাত্রিবেলা হলে তো দরজায় খিল দেয়া থাকতো।

ইরা। (যেন নিমেষে বুঝে ফেলেছে) কেন আর ঝগড়া করছ, অনু? সত্যি যদি থাকতে না চাও, চলে যাও শান্ত ভাবে।

অনতি। ভাব আর এখন শান্ত করা যাচ্ছে না, ইরা-দি। উনি আগে বলুন, কেন উনি আমার ঘরে ঢুকেছিলেন?

হৃষীকেশ। বা, একটা বই খুঁজছিলুম।

অনতি। কী বই?

ইরা। কেন মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছ, অনু? চাকরি ছেড়ে দিতে চাও, ছেড়ে দাও।

অনতি। এ শুধু চাকরি ছাড়া বা নেয়ার কথা নয়, ইরা-দি। তার চেয়ে অনেক বড় প্রশ্ন। (হৃষীকেশকে) বলুন, কী বই?

হৃষীকেশ। হ্যাভলক এলিসের 'সাইকোলজি অফ সেক্স'।

ইরা। তুমিই বা কথার কেন উত্তর দিচ্ছ, বাবা? যাবে তো, যাক না চলে।

অনতি। মাইনে না নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু উত্তর না নিয়ে যাবো না। বলুন, কোন ভল্যুম?

হৃষীকেশ। ফোর্থ ভল্যুম।

ইরা। (বিরক্ত) আঃ, যা খুসি তোমার করো গে। চললুম আমি।

অনতি। (বাধা দিয়ে) দাঁড়ান, শুনে যান সবটা। (হৃষীকেশকে) বইটা কার?

হৃষীকেশ। তোমার। মানে, কাল দুপুরবেলা পড়ছিলুম আমার ঘরে বসে, আজ দেখি, বইটা কে নিয়ে গিয়েছে। তাই খুঁজতে ঢুকেছিলুম তোমার ঘরে। যখন তোমার বই, ভাবলুম তোমার ঘরেই থাকবে।

অনতি। কাল কোথায় পেয়েছিলেন বইটা?

হৃষীকেশ। তাও তোমার ঘরে। তোমার কাছে গিয়ে বললুম, একটা বই-টই দাও পড়তে, তুমি ঐ বইটা দেখিয়ে দিলে।

অনতি। দিলুম। কিন্তু আপনি পড়লেন কেন ঐ নোংরা বই?

হৃষীকেশ। নোংরা বই!

অনতি। আপনার শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে তাই আপনার সাব্যস্ত করা উচিত।

হৃষীকেশ। বলো কি, বিজ্ঞান—

ইরা। যতো সব বাজে কথা—(প্রস্থান)

অনতি। শুনুন—(ফিরলো না দেখে, হৃষীকেশকে) হ্যাঁ, জানি, বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞানের এমনি টান যে আজ একেবারে আমার খাট পর্যন্ত চলে এসেছেন।

হৃষীকেশ। তুমি কী বলছ?

অনতি। (সুর করে) আমি কী বলছি! কাল যখন ঢুকেছিলেন তখন আমি স্নানের আগে চুলে তেল মাখছিলুম। তখনো আপনার ঢোকা উচিত হয়নি আমার মত না নিয়ে। তখন আমার চুল খোলা, আঁচল আঁট নয়।

হৃষীকেশ। আমার মনেই নেই তখন তুমি তেল মাখছিলে না পাউডার মাখছিলে। আমার দৃষ্টি তখন বইয়ের দিকে।

অনতি। (হঠাৎ) আপনি 'প্যারাডাইজ লস্ট' মুখস্ত করতে রাজি আছেন?

হৃষীকেশ। কেন?

অনতি। একবার আপনার ছেলে কি-এক মেয়ে-পার্টের মহড়া দিয়েছিল বলে তাকে দিয়ে 'বৃত্রসংহার' মুখস্ত করিয়ে ছেড়েছিলেন মনে আছে?

হৃষীকেশ। (ত্রস্ত) তুমি কী করে জানলে?

অনতি। ভয় নেই, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার এ পর্যন্ত কোনো কথা হয়নি। জেনেছি আপনার মেয়ের কাছ থেকে।

হৃষীকেশ। (আশ্বস্ত) তাই বলো।

অনতি। তাই বলছি। মুখস্ত করতে রাজি আছেন?

হৃষীকেশ। 'প্যারাডাইজ লস্ট' তো বেশ ভালো বই, নামকরা বই, মুখস্ত করতে দোষ কী। কিন্তু তুমি যদি চলে যাও, মুখস্ত শুনবে কে?

অনতি। মুখস্ত শোনার কথা হচ্ছে না, করার কথা হচ্ছে।

হৃষীকেশ। কিন্তু, কী অপরাধে এই মুখস্তটা করতে হবে শুনি?

অনতি। বুড়ো বয়সে অকারণে হঠাৎ আপনার এই অদ্ভুত জ্ঞান-পিপাসা হয়েছে বলে। ক' দিন 'প্যারাডাইজ লস্ট' নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই এই অন্যায় কৌতূহল আপনার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

হৃষীকেশ। জ্ঞান সম্বন্ধে তোমার এই কুসংস্কার কেন? জানো তো, সক্রেটিস কী বলেছিলেন জ্ঞান সম্বন্ধে—

অনতি। সক্রেটিস নয়, নিউটন বলেছিলেন।

হৃষীকেশ। আমাদের কাছে যা সক্রেটিস তাই নিউটন।

অনতি। আপনার কাছে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে একাকার। কিন্তু কথা তা নয়।

হৃষীকেশ। (ভীত) কী তা হলে?

অনতি। কথা হচ্ছে, আজ যখন আপনি ঘরে ঢুকলেন তখন ঘরের আরেক রকম চেহারা। আজ আমি ছিলুম ঘুমে। আমাকে ঘুমন্ত দেখে তখুনি বই নিয়ে চলে গেলেন না কেন?

হৃষীকেশ। তাই তো গেছি।

অনতি। তাই তো গেছেন! মিথ্যে কথা। এগিয়ে আসেন নি খাটের দিকে?

হৃষীকেশ। এসেছিলুম।

অনতি। হ্যাঁ, স্বীকার করুন। স্বকর্ণে নিজের পাপ শোনাটা পুণ্য। কেন এসেছিলেন?

হৃষীকেশ। তোমাকে একটু দেখতে।

অনতি। আমাকে দেখতে আপনাকে কে বলেছে?

হৃষীকেশ। কে বলবে!

অনতি। কতক্ষণ দেখছিলেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে?

হৃষীকেশ। তা মনে নেই।

অনতি। পাঁচ মিনিট হবে?

হৃষীকেশ। তারো বেশি হতে পারে।

অনতি। তারো বেশি! মধুসূদন! এতক্ষণ ধরে দেখবার মতো কী ছিল শুনি?

হৃষীকেশ। তোমার মুখ। এত দিন জাগা অবস্থায় দেখেছি, এই প্রথম ঘুমের মধ্যে দেখলুম। অপরূপ শান্তি, অপরূপ স্নেহ তোমার মুখে। বলো, খুব অপরাধ করেছি?

অনতি। ঘোরতর অপরাধ করেছেন।

হৃষীকেশ। জানি না করেছি কিনা। তোমাকে দেখে মনটা গলে-গলে পড়ছিল। তোমার শোয়াটি বড় করুণ। মনে হচ্ছিল, তোমার যেন কত দুঃখ, কত কিছু তোমার নেই।

অনতি। হ্যাভলক এলিসের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙলা উপন্যাসও পড়তে সুরু করেছেন নাকি?

হৃষীকেশ। না। মনে হচ্ছিল, তোমাকে যেন আরো স্নেহ করা উচিত। এসেছিলে সামান্য শিক্ষয়িত্রী হয়ে, কিন্তু উদয়াস্ত লেগে আছ এই সংসারের কাজে, আমারই সেবায়। রান্নাঘরে, স্নানের ঘরে, খাওয়ার সামনে। মনে হচ্ছিল—

অনতি। আর সেই সেবার এই প্রতিদান।

হৃষীকেশ। ভাবছিলুম, মাইনেটা তোমার দ্বিগুণ করে দেয়া উচিত।

অনতি। আর তাই ভেবে বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে গায়ে হাত দিলেন তক্ষুনি।

হৃষীকেশ। গায়ে হাত!

অনতি। একেবারে যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন! বলুন বুক ছুঁয়ে, দেননি গায়ে হাত?

হৃষীকেশ। একে তুমি গায়ে হাত দেয়া বলো?

অনতি। তবে কি পায়ে হাত দেয়া বলবো?

হৃষীকেশ। শীত-শীত দুপুর, দেখলুম, তোমার গায়ের কাপড়টা পায়ের কাছে চলে গিয়েছে। তাই সেটাকে আলগোছে ফের গায়ের উপর টেনে আনলুম, চিবুকের নিচেটায় গুঁজে দিলুম আলগোছে।

অনতি। মেয়েদের গায়ের কাপড় সরে গেলে তা ফের আলগোছে টেনে আনবার জন্যেই গভর্নমেণ্ট আপনাকে পেনসন দিচ্ছে নাকি ?

হৃষীকেশ। মিছিমিছি তুমি তিলকে তাল করছ।

অনতি। আর আপনি তালকে করতে চাচ্ছেন সর্ষে। ভাবখানা—ভাজেন পটল, বলেন ঝিঙে। কিন্তু পরের বেলায় অত দাব কেন ?

হৃষীকেশ। পরের বেলায় ?

অনতি। হ্যাঁ, ইরা-দির মামাতো বোনের দেওর যখন ইরা-দির পাশে বসে যাচ্ছিল ট্র্যামে, তখন সেই গা-ঘেঁসে-বসার অপরাধে দেওর-ভদ্রলোককে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন কেন ?

হৃষীকেশ। কত দিন আগেকার কথা, আমার কিছু মনে নেই।

অনতি। থাকবার কথাও নয়। এখন যে রোজার ঘাড়ে এসেই বোঝা চেপেছে। ন্যায়শাস্ত্রের ফ্যাকড়া ছিলেন, এখন হয়েছেন কামশাস্ত্রের কম্পাউণ্ডার।

হৃষীকেশ। তোমার যা খুসি বলো—

অনতি। কিন্তু আপনাকে যা খুসি করতে দেব না। শীতে মরে যাচ্ছি বলে এতই যখন আপনার মায়া হচ্ছিল তখন গায়ের উপর আলোয়ানটা টেনে দিয়েই কেটে পড়লেন না কেন ? কেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে চুলে বিলি কাটতে সুরু করলেন ?

হৃষীকেশ। দেখলুম, কতকগুলি গুঁড়ো-গুঁড়ো চুল চোখের উপর চলে এসেছে, আলগোছে তাই সরিয়ে দিলুম একটু।

অনতি। শুধু দেখে-দেখে বুঝি আশ মিটছিলো না, তাই বুঝি ছুঁতে হাত বাড়ালেন। ভাগ্যিস তখনই জেগে উঠেছিলুম। সরহদ্দ-সীমানা তা নইলে আরো বেড়ে যেত হয়তো।

হৃষীকেশ। তুমি আমার উপর খুব অবিচার করছ, অনতি।

অনতি। যেহেতু আপনার অভিচারটা বরদাস্ত করতে পারছি না।

জেগে যখন উঠলুম, দেখি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছেন মুচকি-মুচকি। ও-হাসির মানে কী?

হৃষীকেশ। ও-হাসির কোনোই মানে নেই। তোমার জাগার মধ্যে ভীষণ রাগ দেখেই অমন হেসেছিলুম।

অনতি। ভেবেছিলেন বুঝি এবার থেকে ঠারে-ঠোরে কথা চলবে।

হৃষীকেশ। ছি-ছি!

অনতি। তবে ঘর ছেড়ে চলে যেতে অমন একখানা গয়ংগচ্ছ ভাব করছিলেন কেন? শেষকালে দাবড়ি দিতেই পালিয়ে গেলেন ইঁদুরের মতো। দাবড়ি না খেলে বুঝি বুড়ো হাড় সজুত হয় না! আর শুধু দাবড়ি কী—দেখবেন কী হয়।

হৃষীকেশ। তুমি মিছিমিছি অমন আগুন হচ্ছ, অনতি! ঠাণ্ডা হয়ে একবার ভেবে দেখ, আমার অপরাধটা কোন জাতের।

অনতি। ঠিক কেউটে জাতের না হলেও একেবারে ঢোঁড়া জাতের নয়।

হৃষীকেশ। কী করেছি আমি! একটু শুধু তোমাকে আমি আদর করেছি—

অনতি। ঘরের মাস্টারনীর সঙ্গে কী আপনার আদরের সম্পর্ক?

হৃষীকেশ। আহাহা, তুমি মাস্টারনী হয়ে আমার যদি অমন প্রাণপণ সেবা করতে পারো, তবে তোমাকে আমি একটু আদর করতে পারি না?

অনতি। না, গায়ে হাত দিয়ে পারেন না। আমি আপনাকে সেবা করি, তার মানে আছে। আপনি আমার 'বস্', প্রভু। আপনাকে তোয়াজ করাই আমার স্বার্থ, চাকরিটি আমার যে করে হোক বহাল রাখতে হবে। আপনি খুসি হন, আমার মাইনে বাড়িয়ে দিন, অন্য কোনো ইচ্ছা না হয় পূরণ করুন, কিন্তু বলা-কওয়া-নেই, গায়ের উপর চড়াও হন কেন?

হৃষীকেশ। মেয়ে ভেবে তোমাকে আমি একটু আদর করতে পারি না ?

অনতি। রাখুন, ঠেকায় পড়ে অমন মেয়ে ডাকতে দিতে আমি রাজি নই। ও সব ফেরেববাজিতে ভুলছি না।

হৃষীকেশ। (অসহায়) তা হলে আর আমি কী করতে পারি বলো।

অনতি। কিছুই পারেন না। যেহেতু আমি এখন জেগে, ঘুমিয়ে নেই। দয়া করে দরজাটা শুধু ছেড়ে দিতে পারেন।

হৃষীকেশ। কেন, যাবে কোথায় ?

অনতি। তা জেনে আপনার কোনো দরকার নেই।

হৃষীকেশ। যদি কোনো বিপদে পড়ো—

অনতি। এর চেয়েও বিপদে কেউ কখনো পড়েছে না কি

হৃষীকেশ। জানি না। তবু একেবারে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাবে বিশ্বাস করতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। যদি ঠিকানাটা দাও—

অনতি। রক্ষে করুন। তারপর এক দিন বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখি ঘাপটি মেরে বসে আছেন। নিদেন চিঠি না লেখেন আমাকে সাবধান থাকতে হবে সব সময়।

হৃষীকেশ। তোমার জিনিসগুলির কী হবে ?

অনতি। ভয় নেই, আমার লোক এসে নিয়ে যাবে সেগুলো। যদি অবিশ্যি দয়া করে ফেরত দেন আপনারা।

হৃষীকেশ। তোমার জিনিস তোমাকে দেব না কেন ?

অনতি। বলা যায় না। ঘটনার স্রোত উত্তাল হয়ে উঠতে পারে এরি মধ্যে।

হৃষীকেশ। আর তোমার মাইনের বাকিটা ?

অনতি। ও আপনি রেখে দিন আপনার কাছে।

হৃষীকেশ। রেখে দেব!

অনতি। হ্যাঁ, তা দিয়ে আপনি আপনার মোকদ্দমার খরচ চালাতে পারবেন।

হৃষীকেশ। মোকদ্দমা! কিসের মোকদ্দমা?

অনতি। বা, এর পর একটা মোকদ্দমা হবে না বলতে চান? ভেবেছেন আমি আপনাকে শুধু-শুধু ছেড়ে দেব?

হৃষীকেশ। এর পর তুমি আবার মোকদ্দমা করবে নাকি?

অনতি। নিশ্চয়ই। নইলে আপনার মতো অমন নীতিবীর ধর্ম-ধ্বজের শিক্ষা হবে কি করে? এখন শুধু ভাববার কথা হচ্চে, মোকদ্দমটা ফৌজদারি করবো না দেওয়ানি করবো।

হৃষীকেশ। ছি ছি ছি, অমন কাজ করো না, অনতি।

অনতি। যখন ঘরে ঢুকে গায়ে হাত দিয়েছিলেন তখন ছি ছি ছি করে ওঠেনি আপনার ভিতর থেকে? মেয়েরা মুখ বুজে সয়ে-সয়ে অনেক প্রশ্রয় দিয়েছে আপনাদের। তারা দুর্বল, নিরাশ্রয়। কিন্তু আমি ও-জাতের মেয়ে নই। আমি অন্যায়ের উৎখাত চাই।

হৃষীকেশ। আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে?

অনতি। স্বচ্ছন্দে। গভীর আনন্দের সঙ্গে। আর আপনাকেও গিয়ে দাঁড় করাবো। হ্যাঁ, পুলিশ-কোর্টেই। মুখে সামান্য টর্চ ফেললেই 'আউটরেজ' হয়, আর এ তো মুখে হাত বুলোনো। কম-সে-কম ছ' মাস আপনার জেল হয়ে যাবে।

হৃষীকেশ। মিথ্যে কথা! তুমি প্রমাণ করবে কি করে? তোমার সাক্ষী কে?

অনতি। এ সব দুষ্কর্ম কেউ সাক্ষী রেখে করে নাকি?

হৃষীকেশ। না করুক, তবু সাক্ষী চাই। এই হচ্ছে এখন নতুন আইন। তোমার চুল কিম্বা আলোয়ান তো সাক্ষী হতে পারবে না।

অনতি। কিন্তু আমার চোখ!

হৃষীকেশ। তোমার চোখ!

অনতি। হ্যাঁ, আমার চোখের সারল্য, নির্ভীকতা, সত্যভাষণের দীপ্তি—এতে বিশ্বাস করবে না ম্যাজিস্ট্রেট?

হৃষীকেশ। কিন্তু আইন করবে না। আইন একটা নিরবয়ব জন্তু। ওর চোখ কান নাক কিছু নেই, চেয়েও দেখে না আর কারু আছে কিনা। ওর আছে শুধু একটা হাঁ। তুমি ভাবছ আমাকে সেই হাঁ-এর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে? বলা যায় না, তুমিও চলে যেতে পারো সেই গহ্বরে। অতএব, ও-পথ মাড়িয়ো না। তার চেয়ে—

অনতি। আপনার কোনো ভাঁওতায়ই আমি ভুলছি না। মোকদ্দমায় হারি-জিতি, আপনার জেল হয় না-হয়, কিছু এসে যায় না। তবু আপনাকে তো পাঁচ জনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবো আপনার সত্যিকার চেহারায়। খসে যাবে তো আপনার ভণ্ডামির মুখোস। তাই যথেষ্ট। আইনের চেয়েও বড়ো আছে ধর্ম। সে বুঝবে, সে ভুল করবে না। ভুল করবে না সমাজ। দু'য়ে দু'য়ে ঠিক সে চার করবে।

হৃষীকেশ। কিন্তু তোমার নিজের সম্মানহানির কথাটাও ভেবে দেখো।

অনতি। আমার সম্মানের আর আছে কী! চাকরি করতে এসে নাকে খত দিতে হলো তার আর কিসের মর্যাদা? কিন্তু আপনাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেব না আপনার ঐ সুনামের চূড়ার উপর। ভেঙে ভূমিসাৎ করে দেব। পেনসন গাপ হয়ে যাবে।

হৃষীকেশ। ও-সব কেলেঙ্কারি কোরো না, অনতি। তুমি বুঝছ না—

অনতি। কেলেঙ্কারির আপনি দেখেছেন কী! তারপর খবরের কাগজগুলোকে লেলিয়ে দেব না আপনার পিছে? পত্র লিখে আপনার

কেচ্ছা গেয়ে বেড়াবো না রাস্তায়-রাস্তায় ফিরিওয়ালাদের ভাঁজা গলায়? আপনি ভেবেছেন কী! ঘোরেল সব লোক আছে আমার হাতে। আপনাকে টিকতে দেব না।

হৃষীকেশ। শোনো। তার চেয়ে কিছু টাকা কবলাচ্ছি, ছেড়ে দাও আমাকে।

অনতি। (মূঢ়) টাকা?

হৃষীকেশ। হ্যাঁ, এমনিতে যখন শুনবে না, কিছু টাকা নিয়ে রফা করে দাও ব্যাপারটা। ভালো-মন্দ সত্যি-মিথ্যে সব ধামা-চাপা থাক।

অনতি। (চিন্তিত) টাকা। কত টাকা দেবেন শুনি?

হৃষীকেশ। অসম্ভব কিছু না হয়।

অনতি। আপনি যেমন কৃপণ, পাঁচ টাকা বললেও আপনার অসম্ভব মনে হতে পারে। আচ্ছা, আপনার ছেলের বিয়েতে কত পণ নেবেন ঠিক করেছেন?

হৃষীকেশ। কিছুই ঠিক করিনি। নাও নিতে পারি শেষ পর্যন্ত।

অনতি। আপনি আবার নেবেন না। খালি-ঘর পেয়ে চোর চুরি করবে না বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু আপনি মেয়ের বাপ পেয়ে টাকা হাঁকবেন না এ মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারবো না। না, দরকার নেই আমার টাকায়। ওটা নিতান্তই ব্ল্যাকমেলের মতো দেখায়। হয়তো তার চেয়েও অশ্লীল। দরকার নেই, আপনার মর্চে-পড়া টাকা সিন্দুকেই রেখে দিন। আমার পক্ষে সোজা যে পথ, প্রত্যক উৎপীড়িতের যা অবলম্বন, সেই আইনেরই আমি আশ্রয় নেব।

হৃষীকেশ। (করুণ) তোমাকে মিনতি করছি, ও ছাড়া আর যে কোনো শাস্তি আমাকে দাও, আমি কিছু বলতে আসবো না।

অনতি। আপনি তো আর ইস্কুলের ছাত্র নন যে দু'হাতে ইটের

পাঁজা নিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবো রোদ্দুরে। কিম্বা কপিকলে লটকে রাখবো দড়ি বেঁধে।

হৃষীকেশ। তবু তা বোধ হয় আদালতের কাঠগড়ার চেয়ে ভালো।

অনতি। আপনার ভালো দিয়ে তো সমাজের ভালো হবে না। সুতরাং আর কথা নয়, পথ ছাড়ুন।

হৃষীকেশ। বুড়ো বয়সে আমার মুখে আর চুন-কালি মাখিয়ো না।

অনতি। বয়েসটা যে বুড়ো আয়নায় তা না হলে বুঝবেন কি করে?

হৃষীকেশ। হাত জোড় করে মিনতি করছি, তোমাকে মা বলে ডাকছি—

অনতি। কী বলে?

হৃষীকেশ। (গদ্গদ) মা বলে।

অনতি। দেখুন, ও-সব সস্তা প্যাঁচে আমি ভুলছি না। মেয়ে হলো, মা হলো, আর রইলো কী! মা-ফা উপন্যাসে চলতে পারে, আমার কাছে চলবে না। আমি যা ঠিক করছি তা ঠিকই করেছি। যেতে দিন।

হৃষীকেশ। (বিগলিত) শোনো, মিনতি করছি পায়ে ধরে—

অন্য দরজা দিয়ে নীরেনের প্রবেশ। আফিস-ফেরৎ। বয়সে ঊনত্রিশ-ত্রিশ, কাঠখোট্টা চেহারা। সাহেবি পোশাক পরনে। চলাফেরা, কথা বলা সবই দ্রুত।

নীরেন। কিসের কী মিনতি করছ, বাবা? দিদি ফোন করলো অফিসে, বাড়িতে কী গোলমাল, মিসট্রেস বাবার সঙ্গে রাগ করে চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছে, তাই চলে এলুম। ইস্তাফা দিচ্ছে তো দিক না, চলে যাক না যেখানে ইচ্ছে সেখানে। অত আরার সাধ্যসাধনা কিসের? একটা বিজ্ঞাপন দিলে কত মাস্টারনী কাকের মতো বসবে এসে দরজার চৌকাঠে।

অনতি। কিন্তু কেন চলে যাচ্ছি, কারণটা খোঁজ করেছিলেন ?

নীরেন। কোনো দরকার নেই। চলে যাচ্ছেন এতেই অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করছি। বাড়ির মধ্যে সর্বক্ষণ একটা বেসম্পর্ক মেয়েমানুষ, প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। যান, আর দেরি করছেন কেন ? ঘরে হাওয়া ঢুকতে দিন একটু।

অনতি। কেন যাচ্ছি যদি শোনেন, তবে আপনার সমস্ত সহানুভূতি আমার উপর এসে পড়বে।

নীরেন। কোনো অবস্থাতেই কোনো মাস্টারের উপর আমার আর সহানুভূতি নেই।

অনতি। না, আপনাকে শুনতে হবে। আমি শুয়ে ঘুমুচ্ছিলুম আমার ঘরে,—

হৃষীকেশ। আর আমি একটা বই খুঁজতে ঢুকে পড়েছিলুম।

নীরেন। তাতে কী হয়েছে !

অনতি। কী হয়েছে ?

নীরেন। নিশ্চয়ই, কী হয়েছে ! এই বাড়ি-ঘর তো আপনার নয়। আমাদের বাড়ি। যখন খুসি যে ঘরে খুসি আমরা ঢুকবো। আপনার না পোষায় পথ দেখুন।

অনতি। আচ্ছা, ঘরে ঢুকলেন তো আমার ঘুমন্ত দেহের দিকে উনি তাকিয়ে রইলেন কেন ?

নীরেন। আহাহা, উনি একজন কী রূপসী যে ওঁর দিকে ড্যাবডেবে চোখ করে তাকিয়ে থাকতে হবে ? ছিলেন তো ঘুমিয়ে, বুঝলেন কি করে কে তাকিয়ে আছে বা না আছে ? না কি, ঘুমের মধ্যেও দেহের আস্বাদটা ভুলে যান না ?

অনতি। আচ্ছা, দেখছিলেন দেখুন। কিন্তু গায়ে উনি হাত দেন কেন ?

হৃষীকেশ। (সাহস পেয়ে) মিথ্যে কথা। শীত দেখে শুধু গায়ের উপর আলোয়ানটা টেনে দিয়েছিলুম।

অনতি। তাই বা দেবেন কেন? ধরবেন কেন আমার গায়ের আলোয়ান?

নীরেন। ধরবার দরকার ছিল। দেখছিলেন, ঐ আলোয়ানটা সত্যিই আপনার কিনা, না, চোরাই।

অনতি। বেশ, চমৎকার। কিন্তু কপালের উপর চুল নিয়ে খেলা করছিলেন কিসের অজুহাতে?

নীরেন। কপাল তো উইয়ের ঢিপি, আর চুল তো নয়, শনের দড়ি। তার আবার খেলা! আর সে-খেলায় কপালে আপনার ফোস্কা পড়েছে, না? (এগিয়ে) কই, দেখি।

অনতি। এই আপনাদের নারীর প্রতি সম্মানের জ্ঞান?

নীরেন। আর আপনার এমন একখানা সম্মান, বাতাসের ফুঁয়ে তা ভুঁয়ে পড়ে। আপনার জ্বর হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে কপালে যদি হাত রাখি তা হলে সতীত্বতেজে কপালটা আপনাব ফটে যাবে?

হৃষীকেশ। আর তারি জন্যে উনি ফৌজদারি করতে চলেছেন।

নীরেন। যান না। অত বড়ফট্টাই কিসের? সামান্য তো মাস্টারনী, তার আবার নাচতে এসে ঘোমটা টানা কেন? আমরা পারবো না নালিশ দাগতে?

হৃষীকেশ। (উৎসাহিত) নিশ্চয়ই। ব্ল্যাকমেলিঙের নালিশ। বলে কিনা, টাকা দিয়ে রফা করুন। ছেলের বিয়েতে যত পণ নেবেন তত টাকা।

নীরেন। এ যে দেখছি আবদারের ঢালাঢাল।

হৃষীকেশ। বলে কিনা কাগজওয়ালাদের লেলিয়ে দেবে।

নীরেন। কাগজওয়ালারা জানে কার দিকটায় লেলাতে হয়।

কাগজের কাটতি বাড়ে কার ছবি ছাপলে। আমার ফার্মের বিজ্ঞাপন আছে সবগুলি কাগজে, কিচ্ছু ভয় নেই বাবা, আমাদের সম্বন্ধে কেউ টুঁ করবে না। মাস্টারনীর ধাস্টামো তারা টিট করে দেবে।

(ইবার প্রবেশ)

ইরা। (নীরেনকে) কী বাজে বকছিস? ওর যা মাইনে চুকিয়ে দিলেই তো ও চলে যেতে পারে।

নীরেন। কত পাওনা হয়েছে এ ক'দিনে?

ইরা। বারো টাকা সাড়ে এগারো আনা। আছে?

নীরেন। নিশ্চয়। (মনিব্যাগ বের করে টাকা গুনতে-গুনতে) এই যে। এরি জন্যে গলা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণ? এই নিন, এই নিন আপনার টাকা। (অনতি অচল) নিন, ধরুন, হাত পাতুন। (অনতি নিস্পন্দ) শেষকালে কিন্তু হাতের মধ্যে গুঁজে দেব জোর করে। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে কিছু বলতে পারবেন না। (বলতে-বলতেই হাতের মধ্যে গুঁজে দিতে গেল জোর করে)

অনতি। (নোটে জড়ানো টাকার ডেলাটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) স্কাউণ্ড্রেল।

নীরেন। কি, কী বললেন?

অনতি। স্কাউণ্ড্রেল! র‍্যাগামাফিন!

নীরেন। মুখ সামলে কথা বলো বলছি।

অনতি। একশো বার বলবো। অভদ্র, চাষা, জানোয়ার।

নীরেন। হাত ধরে টেনে হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে বাড়ির বের করে দেব বলে রাখছি। মেয়ে-ফেয়ে বলে আমার কোনো দুর্বলতা নেই।

অনতি। ধরুন দেখি, আপনার কেমন স্পর্ধা। ইতর, ছোটলোক।

নীরেন। কী? (ধরলো অনতির হাত চেপে। টেনে ধরে) যান, চলে যান আমাদের বাড়ি থেকে।

অনতি। (ইরাকে, প্রায় কাঁদ-কাঁদ) ইরা-দি।

ইরা। কী করছিস, নীরেন? (নীরেন হাত ছেড়ে দিল। অনতিকে) তুমিই বা মাইনে পেযে মানে-মানে চলে যাচ্ছ না কেন?

অনতি। (নিজেকে একটু গুছিযে নিয়ে) এবার যাই। তার আগে আপনাদের ফোনটা আমাকে একটু ব্যবহার করতে দেবেন?

ইরা। কেন?

অনতি। থানায একটা খবর দেব।

হৃষীকেশ। থানা।

অনতি। হ্যাঁ। আগে ভেবেছিলুম নিজেই কমপ্লেন করবো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, এখন, এর পর, থানায ডায়রি না করলে চলছে না। (ইরাকে) পাবো ফোন করতে?

নীরেন। ককখনো না। থানায যেতে হয ডানা মেলে চলে যাও রাস্তা দিযে।

অনতি। তাই যাচ্ছি। হাজতবাসের জন্যে প্রস্তুত থাকুন। (প্রস্থানোদ্যত)

নীরেন। আচ্ছা, আচ্ছা, কে কোথায় থাকে তা দেখা যাবে।

অনতি। বেশ, পুলিশ নিয়ে আসছি আমি এখুনি। দেখবেন, রণে ভঙ্গ দেবেন না যেন। বাড়িতে মোতাযেন থাকবেন।

হৃষীকেশ। পুলিশ।

অনতি। হ্যাঁ, লাল পাগড়ি। দেখি বাপ-ছেলেকে একসঙ্গে পুরতে পারি কিনা। (প্রস্থান)

হৃষীকেশ। (নীরেনকে) তুই ডোবালি, সব ছারখার করে দিলি।

আমি কত কষ্টে মা-ফা বলে হাতে-পায়ে ধরে ঠাণ্ডা করেছি, তুই কোত্থেকে এসে পাকা ঘুঁটি সব কাঁচিয়ে দিলি। (অস্থির) কী করি আমি এখন !

ইরা। গোঁয়ারের মতো তুই ওর হাত চেপে ধরতে গেলি কেন ?

হৃষীকেশ। রণচণ্ডী মেয়ে। কপালে কি একটু হাত রেখেছিলুম বলে এত তম্বি, আর এ একেবারে ‍স্টাপস্টি গায়ে হাত! এতগুলি লোকের সামনে! তুই কি আজকাল নেশা ধরেছিস নাকি ?

ইরা। আর এমন ভাবে কথা বলছিস যেন ও একটা রদ্দিমার্কা মেয়েমানুষ।

হৃষীকেশ। দস্তুরমতো গ্র্যাজুয়েট। যেমন শক্ত তেমনি ধারালো। সতি-সত্যি যদি নিয়ে আসে পুলিশ ?

ইরা। আনবেই তো। এত অপমান ও নির্বিবাদে হজম করবে নাকি ?

হৃষীকেশ। সত্যি, বাড়ি যদি পাহারালারা ঘিরে ফেলে? যদি থানায় ধরে নিয়ে যায় ? হাতে হাতকড়া লাগায়? উপায় কী এর ? আমার পেনসন ?

ইরা। যে করে হোক ওকে ফিরিয়ে আনতে হয়। নিশ্চয়ই বেশি দূর এখনো যায়নি ও।

হৃষীকেশ। হ্যাঁ, ফিরিয়ে আনতে হয়। যে করে হোক।

ইরা। দেরি করলে চলবে না এক মিনিট। যে হঠকারী মেয়ে, একবার থানায় গিয়ে পৌছুলে রক্ষে রাখবে না। উত্তেজনায় অনেক কিছু বাড়িয়ে বলবে।

হৃষীকেশ। একটা রিক্সা করে তুই যাবি ?

ইরা। আমি যাবো কী বাবা। আমি কখনো রাস্তায় বেরুই একলা ?

নীরেন। (আকস্মিক) আমি গিয়ে নিয়ে আসি।

হৃষীকেশ। তুই ?

নীরেন। হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর কাউকে তো দেখছি না বাড়িতে।

হৃষীকেশ। তুই তাকে আনবি কি করে?

নীরেন। নাকেখত বা কানমলা খেয়ে হবে না, জোর করে পাঁজাকোলে করে নিয়ে আসবো।

হৃষীকেশ। সর্বনাশ হবে। রাস্তার মাঝখানেই সুভদ্রা-হরণের যাত্রা জুটে যাবে। এমনিতে হাতে, শুধু হাতকড়া পড়তো, এতে দড়ি পড়বে কোমরে। খালি পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে।

নীরেন। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

হৃষীকেশ। উপায় নেই তো, খেপাতে গেলি কেন মেয়েটাকে? সাধতে গেলেও টলে না, জোর দেখাতে গেলেও রুখে উঠে। এর চেয়ে বাঘ বাগানো সহজ।

ইরা। এক উপায় শুধু আছে। চোখ বেঁধে বিয়ে করে নিয়ে আসা।

হৃষীকেশ। আর চোখ খোলামাত্রই আবার থানা।

নীরেন। আমি যাই বাবা। সাধ্যসাধনা করে যেমন করে পারি নিয়ে আসি।

হৃষীকেশ। রাস্তায় কোনো 'সিন' করবি না?

নীরেন। না।

হৃষীকেশ। বেশ ঠাণ্ডা ভাবে কথা কইবি?

নীরেন। অতিশয়।

হৃষীকেশ। অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইবি পায়ে ধরে?

নীরেন। দরকার নেই। সেও সেই গায়ে হাত দেয়াই হবে। ফণা তুলে আবার ফোঁস করে উঠবে হয়তো।

ইরা। উঠবে তো উঠবে। এদিকে এতক্ষণে পৌঁছে গেল যে থানায়!

নীরেন। সত্যি, কি হবে কে জানে! (দ্রুত প্রস্থান)

হৃষীকেশ। ডোবাবে, আবার সব ও ডোবাবে, ইরা। (চেঁচিয়ে) তোর যেতে হবে না, নীরেন। যেতে হবে না। তুই থাম।

নীরেন। (সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে) যে করে হোক নিয়ে আসতে পারলেই তো হলো। ছলে বলে কৌশলে।

হৃষীকেশ। হ্যাঁ, যে করে হোক। (চেয়ারে বসে পড়লেন)

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। আস্তে-আস্তে আবার আলোকিত হল এক মিনিট পর। এই এক মিনিট বাস্তব ঘটনার পনেরো মিনিটের সমান। মঞ্চে আলো ফুটছে, আর নীরেন 'দিদি' বলে ডাকতে-ডাকতে প্রবেশ করছে। পিছনে অনতি। মাথার উপরে আঁচল তোলা। হাসিমুখ।

(ইরার প্রবেশ)

ইরা। আনতে পারলি ধরে?

অনতি। না এসে উপায় কী বলুন। ভাগ্যিস তখন আপনি বুদ্ধি করে পাঠিয়েছিলেন ওঁকে।

ইরা। আর কেমন বিয়ের একটি সূক্ষ্ম ইসারা করেছিলুম। আমি যে তার আগেই জেনে গেছি সব।

অনতি। কখন জেনেছেন?

ইরা। নীরেনকে ফোন করতেই। ও বললে, এই সুযোগ বাবাকে চেপে ধরবার। তারপর আমিও লেগে গেলাম তোমাদের ষড়যন্ত্রে।

নীরেন। বাবা কোথায়?

ইরা। বাথরুমে।

নীরেন। পুলিশের ভয়ে?

ইরা। বড্ড ক্লান্ত বোধ করছেন হয়তো।

অনতি। এখন সুখী হবেন, না, শ্যক পাবেন?

ইরা। সুখীই হবেন হয়তো। আর যা ওঁকে কোণঠাসা করে এনেছিলে তোমরা। যদিও খেলাটা সব সময়ে পরিচ্ছন্ন ছিল না।

অনতি। আপনি তো জানেন, যুদ্ধে আর প্রেমে অপরিচ্ছন্ন বলে কিছুই নেই।

নীরেন। আর ভেবে দেখ দিদি, কী সাধনা, কী সংযম! কত দিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষা। কত মন্ত্রণা, কত চক্রান্ত! এর সমাপ্তিটাও কি সার্থক হবে না বলতে চাও?

ইরা। সত্যি, এক বাড়িতে থেকে কী করে কথা না বলে থাকতে পেরেছিলি তোরা?

নীরেন। চোখে-চোখেও না তাকিয়ে। কত ত্যাগ, কত পীড়ন, কত নিগ্রহের পথ দিয়ে চলেছি দু'জন। সব একদিন পাবে না সম্পূর্ণতা? শুধু বাবার একটা অন্ধ গোঁড়ামিই তাকে নিরর্থক করে রাখবে? তা কখনো হয়? দুজনেই বাবাকে সত্যে আবদ্ধ করে নিয়েছি। আর কী করে ফেলবেন আমাদের।

অনতি। সবই তো হলো একরকম, কিন্তু ভাবছি, হাতের ব্যথাটা আমার সারবে কিসে? এমন তখন খিঁচে টেনে ধরলে হাতটাকে, হাড় পর্যন্ত ব্যথা হয়ে আছে।

নীরেন। আর তোমার কী চোস্ত গালাগাল! উঃ, যেন লাভা বেরুচ্ছে ভলক্যানো থেকে। আর কী উচ্চারণ! যেন বেঁধে গিয়ে একেবারে বুকের মধ্যে।

(বলতে-বলতে অপরিমিত-খুশি হৃষীকেশের প্রবেশ)

হৃষীকেশ। বিঁধবে না! একশোবার বিঁধবে! চাষার মতো ব্যবহার করবি, আর চাষা বলতে পারবে না! ফিরে এসেছ আমার অনতি-মা?

অনতি। হ্যাঁ বাবা, ফিরে এসেছি। (হৃষীকেশকে প্রণাম)

হৃষীকেশ। এ কি, এ কি তোমার মাথায়?

ইরা। ও লাল পাগড়ি নয়, বাবা, সিঁদুর।

হৃষীকেশ। (স্তম্ভিত) তার মানে ?

ইরা। যে করে হোক আনতে বলেছিলেন বলে নীরেন অনতিকে একেবারে বিয়ে করে এনেছে।

হৃষীকেশ। বিয়ে ?

অনতি। হ্যাঁ, বাবা, বিয়ে। নইলে আসতুম না ফিরে। আপনি আমাকে মেয়ে বলেছেন, মা বলেছেন, বাকি আছে শুধু বউ-মা।

যবনিকা

আসুক সে !

পা ত্রা গ ণ

ইলা

কালিন্দী

পুঁটু

স্থান ঃ   বালিগঞ্জ এভিনিয়ু, ইলাদের ড্রয়িং-রুম

সময় ঃ   ১৩৩৬-এর পনেরোই বৈশাখের মধ্যাহ্ন

প্রশস্ত ঘর—সোফায় আকীর্ণ। মধ্যে প্রকাণ্ড একটা টেবিল, বিলিতি ও দিশি পত্রিকার ঠাসা। উত্তর-পশ্চিম কোণে লিখিবার একটি ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তাহার উপর একটা পিতলের ফুলদানি। সামনে একটি চেয়ার। মেঝেতে গালিচা পাতা। জানালায় পর্দা ঝুলিতেছে। ঘরটিকে ইহার চেয়ে বেশি আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া সাজাইবার দরকার নাই।

একটা লম্বা সোফায় একটি তরুণী বসিয়া আছে—বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছে, অর্থাৎ পরনের শাড়িটা ঠিক ততখানি গোছানো নাই। মেয়েটির নাম কালিন্দী—বয়স ঠিক বাইশ, রঙ শ্যামল, ঘসা-মাজায় একটু জৌলুস ফুটিয়াছে চশমা-পরার দরুন মুখখানিকে একটু বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়। শাড়ির রঙটা ফিরোজা, ব্লাউজও তদ্রূপ। ঘাড়ের উপর বিশাল খোঁপাটা যেন বিরহীর দীর্ঘনিশ্বাস লাগিয়া ধ্বসিয়া যাইবে—এত আলগা। পিঠটা একটু কুঁজো মতো। যবনিকা-ওঠার সময় দেখা গেল কালিন্দী দুই পা দিয়া তাহার একপাটি নাগরা-জুতো নিয়া একটু খেলা করিতেছে।

লিখিবার টেবিলের ধারে চেয়ারের উপর দেখা গেল আরেকটি মেয়ে। এই ইলা : এ-বাড়ির বড় মেয়ে। বয়স বাইশ পার হইয়াছে, কিন্তু প্রথম চোখে পড়িলে মনে হইবে বত্রিশ। মনে হইবে জননী, কিন্তু আশ্চর্য এই যে আজো তাহার বিবাহ হয় নাই মুখে রঙ মাখানো, এখন সেই রঙ ঘামে গলিয়া আসিয়াছে। সাজসজ্জা জাঁকালো নয়, উৎকট—চক্ষু ধাঁধিয়া দেয়। যেন একটা রঙের তুফান। চুল 'সিঙল্' করা—শাড়িটা গায়ের সঙ্গে আঠার মতো লেপটানো, শাড়িকে দড়ির মতো করিয়া গায়ে—জড়াইয়াছে নহে, বাঁধিয়াছে। ব্লাউজের হাতা দুইটা কাঁধের প্রান্ত হইতে মাত্র ইঞ্চি দুয়েক নামানো ; দুই বাহু প্রখররূপে অনাবৃত। হাতের নখগুলি ত্রিভুজাকারে সূচ্যগ্র করিয়া কাটা ; ধবধবে। দাঁত এখনো দেখা যাইতেছে না পায়ে গ্রিসিয়ান স্যাণ্ডেল। যবনিকা-ওঠার সময় দেখা গেল একটা আধখানা সিগারেট ইলা ছাইদানিতে পিষিতেছে।

যবনিকা-ওঠার পর এক মিনিট স্তব্ধতা। ইলা একটু পায়চারি করিয়া জানলার পর্দা সরাইয়া বাহিরে একটু মুখ বাড়াইল। তাহার পর বড় টেবিলের উপরকার কাগজগুলি একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া কালিন্দীর মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসিল। ডান হাঁটুর উপর বাঁ পা-টা ধীরে উঠাইয়া দিল। তাহার পর আবার উঠিয়া 'রেগুলেটার'-এ পাখার বেগটা আরো একটু বাড়াইয়া ফের আসিয়া আরেকটা সোফায় বসিল ; খানিকটা অর্ধশয়নের ভঙ্গিতে। একটু ঘুমাইয়া লইলে ভালো হয়।

কালিন্দী। (পা দিয়া জুতো নিয়া খেলা বন্ধ করিয়া) বোধ হয় হোটেলে গিয়েই উঠেছে।

ইলা। (না নড়িয়া, অর্থাৎ সোফায় তেমনি গা এলাইয়া রাখিয়াই) ইস!

কালিন্দী। হোটেলে ওঠাটাই ফ্যাশানেবল। চল্, একবার কন্টিনেণ্টালটা ঘুরে আসি।

ইলা। বয়ে গেছে! এখানে তাকে আসতেই হবে।

কালিন্দী। বয়ে গেছে! তার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, স্টেশনে পা দিয়েই পাখা গজাবে। এতই যখন গরজ, স্টেশনে গিয়ে সেলাম ঠুকলেই পারতিস।

ইলা। (আগের সুরে) বয়ে গেছে! তাতে তাকে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হত। সে-জন্যেই তো আমি যাইনি স্টেশনে।

কালিন্দী। বটে! (একটু চুপচাপ) তাই তার অভিমান হয়েছে। দু' বচ্ছর পর বিলেত থেকে আসছে। স্টেশনে 'রিসিভ' করবার জন্যে লোক নেই। আমি হলে তো ফিরতি মেলে ফের বিলেত চলে যেতুম।

ইলা। তুই গেলি না কেন?

কালিন্দী। বয়ে গেছে! সেধে আমি বাড়িতে অতিথি ডাকতে যাই আর কি! আমার তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

ইলা। তাই সে অভিমান করে আর আমাদের কাছে আসেনি। সোজা হোটেলে গিয়ে উঠেছে। চল্, গ্র্যাণ্ড হোটেলটা একবার ঘুরে আসি।

কালিন্দী। (হাসিয়া) তাই হবে। কিন্তু খুঁজে বের করার চেয়ে বসে থাকায় সুখ বেশি।

ইলা। তাই বুঝি পথ চেয়ে বসে থাকার জন্যে আমার বাড়ি এসেছিস? বাড়ি যা, পোড়ারমুখি!

কালিন্দী। আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই ফাঁকে তুমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে খুঁজতে যাবে? বেশ, আমি চললাম। (পা বাড়াইয়া জুতা গুছাইতে লাগিল)

ইলা। (হাসিয়া) আর, তুমি বাড়ি যাবার নাম করে এই ফাঁকে সোজা কন্টিনেণ্টালে চলে যাও আর কি! (ধমক দিয়া) বোস্!

কালিন্দী। সত্যিই আমি বাড়ি যাই এবার। (প্রস্তুত হইয়া) গিয়ে হয় তো দেখব আমার বাড়িতেই সে উঠেছে।

ইলা। হাঁ, তাই যাও; তোমার বাড়িতে আবার ফোন নেই। ইতিমধ্যে সে এখানে এসে পড়ুক, তোমাকে তখন একটা খবরও দিতে পারবো না। শেষকালে আফশোষ করবি, দু' বছরের অদর্শনের পর প্রথম মিলনের 'থ্রিল' থেকে বঞ্চিত হবি। বোস্ চুপ করে।

কালিন্দী। আমার বাড়িতে ফোন নেই, সে একটা মস্ত অসুবিধে।

ইলা। নিশ্চয়ই।

কালিন্দী। আমার নয় তোর পক্ষে। গিয়ে দেখবো সে বসে আছে, তখন তোকে একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারবো না। সন্ধ্যে হলে দু'জনে বেড়িয়ে তবে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসবো। ও তখন পুরোনো হয়ে গেছে—ওর বিলিতি হাওয়া আমি সব শুষে নিয়েছি। তোর জন্যে যা থাকবে, 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড'।

ইলা। (হাসিয়া) তাই যদি হবে তবে আমার বাড়ি এলি কেন?

কালিন্দী। (হাসিয়া) প্রথম মিলনের 'থ্রিল' থেকে তোকে বাঁচাতে। ভ্যাখ, যাব নাকি চলে?

ইলা। (শ্রান্ত) না। পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকায় সুখ বেশি।

কালিন্দী। চুপ করে নয়। রবি ঠাকুরের একটা কবিতা পড়, উন্মনমুখী!

ইলা। (ঠোঁট কুঁচকাইয়া) কবিতা পড়া !—তার চেয়ে আয় এক-হাত 'ড্র-ব্রিজ্' খেলি।

কালিন্দী। (ঠোঁট কুঁচকাইয়া) 'ফ্রাইটফুল' ! আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে আয় ঘুমুই।

ইলা। আয় ! (শরীরটাকে আরো একটু এলাইয়া দিল)

কালীন্দী। আমরা ঘুমিয়ে পড়লে যদি ও আসে ! তবে কাকে আগে জাগাবে বল তো ?

ইলা। ও এলে আমাকে আর বলে দিতে হবে না। ওর আভাস পেলেই আমি জেগে উঠবো। আমার ঘুম ভারি পাতলা। কবিত্ব করিয়া) এত পাতলা যে, কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রে চাঁদ একটু উঁকি দিলেই আমি জেগে উঠি।

কালিন্দী। তুই বোকার মতো আপনি জেগে উঠবি, আর ও আমাকে জাগাবে—গায়ে ঠেলা দিয়ে। সেই হবে আমার প্রথম রোমাঞ্চ।

ইলা। আমি ওকে বাধা দেব, ওর হাত ধরে ফেলবো। ওকে ঐ কোণে টেনে নিয়ে যাব, একই সোফায় পাশাপাশি বসে (কবিত্ব করিয়া) চুপি-চুপি, নিঃশব্দে, রাত্রির নিঃশ্বাসপতনের মতো মৃদুল—অন্ধকারের মতো অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করবো।

কালিন্দী। আর, আমার ঘুম এত গভীর যে আমি মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়ে থাকবো। তবু জাগবো না, ও আমাকে জাগাবে। আমি আগে ওকে ছোঁব না, ও আমাকে আগে ছোঁবে।

ইলা। (ঈর্ষায়) ইস। আমি তোকে জাগাবো—গায়ে ধাক্কা মেরে।

কালিন্দী। (ঠোট উল্টাইয়া) জাগবোও না।

ইলা। গালে চিমটি কেটে দেব।

কালিন্দী। ক্যাঁক্ করে আঙুল কামড়ে দেব।

ইলা। (হাসিয়া) দূর পোড়ারমুখী ! (উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিল)

কালিন্দী। তার চেয়ে এক কাজ করি আয়!

ইলা। আয়!

কালিন্দী। ওর জন্যে সারা সকাল বসে যত সব খাবার তৈরি করেছিস, নিয়ে আয়। দু'জনে মিলে খাই। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ইলা। ভীষণ! খাই, এমন সময় ও আসুক !

কালিন্দী। বেশ তো! আসুক না।

ইলা। ও কি খাবে ?

কালিন্দী। ও এলেই দু'জনে সোজা দাঁড়িয়ে পড়বো। ঠোঁট উলটিয়ে বলবো—তোমার জন্যে কিছু আর নেই।

এমনি সময় রাস্তায় মোটরের হর্নের আওয়াজ হইল। দুই জনের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য দারুণ চোখ-চাওয়াচায়ি হইয়া গেল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ইলা লাফাইয়া উঠিয়া একেবারে রাস্তার ধারের জানলার কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কালিন্দীও জায়গা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু এক পা-ও নড়িল না। ইলার আনন্দোদ্ভাসিত মুখের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া দুয়ারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

ইলা। (জানলা হইতে ফিরিয়া) কেলেঙ্কারি !

কালিন্দী। (সোফায় বসিয়া পড়িয়া) দাঁড়ালো না? কে গেল মোটরে ?

ইলা। কে এক মাড়োয়ারি। (কালিন্দীর হাসি) জমি দেখতে বেরিয়েছে

কালিন্দী। বেশ তো, ওকেই ডাকলি না কেন? দুপুরটা বসে-বসে বেশ ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলা যেত।

ইলা। (রিস্ট-ওয়াচ দেখিয়া) সাড়ে-বারোটা। এতক্ষণে পৌঁছনো ছেড়ে—

কালিন্দী। (কথা লুফিয়া নিয়া) বিয়ে হয়ে যেত !

ইলা। (সামান্য চটিয়া) ঠাট্টা নয়, কালি। তোমার তো কিছু নয়,

দু'দিন 'ককেট্রি' করেই খালাস। তোমার জুতোতে তো আর পেরেক ওঠে নি। আমি এর দস্তুরমতো প্রতিশোধ নেব। (সোফায় বসিল)

কালিন্দী। কী প্রতিশোধ নিবি ?

ইলা। ককখনো ওর সঙ্গে কথা কইবো না।

কালিন্দী। ভারি প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তুই না-ই বা কইলি ; আমি ওকে ঐ কোণে টেনে নিয়ে যাব। ভারি চুপি-চুপি, অতি নিঃশব্দে, গভীর প্রগাঢ়স্বরে দু'জনে গল্প করবো বসে-বসে।

ইলা। তুই কথা কইবি ওর সঙ্গে ? ওকে শাসন করা উচিত।

কালিন্দী। (হাসিবার চেষ্টায় ঠোট একটু কাঁপাইয়া) আমি কেন কইবো না ? (একটু বিমর্ষ) আমার তো আর কিছু নয়। আমার দু'টি দিনের আয়ু,—দু'টি দিন 'ককেট্রি' করেই খালাস।

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। সামনের রাস্তা দিয়া আরেকটা চলন্ত মোটরের শব্দ শোনা গেল। ইলা আর কালিন্দীতে ক্ষণকালের জন্য আবার চোখচাওয়াচাওয়ি হইল। কিন্তু এইবার কেহ তার উঠিল না। দূরায়মান মোটরের শব্দ শূন্যে মিলাইয়া গেল। দুইজনেরই মুখে স্বল্প হাসি—কিন্তু বেদনায় বিশীর্ণ।

কালিন্দী। (চশমা খুলিয়া আঁচল দিয়া কাঁচ মুছিতে মুছিতে) আজ আসবে তো ঠিক ?

ইলা। (আপন মনে চটিয়া) আসবে না কী। কাল ওর চিঠি পেয়েছি—বম্বে থেকে। একদিন সেখানে হল্ট করে আজ শুক্রবার পৌঁছুবে—সকাল বেলা সাতটা ছত্রিশে। গভর্নরের বাড়ি কাল ওর 'ইনটারভিয়ু'র দিন। আসবে না।

কালিন্দী। (চশমার নাকি-টা ঠিক মতো বসাইতে-বসাইতে উদাসীন-স্বরে) চিঠি তো আমাকেও লিখেছে।

ইলা। (চমকিত ও ব্যথিত) তোকেও লিখেছে ? আর কী লিখেছে শুনি।

কালিন্দী। কত! সে আমি তোকে বলতে যাবো কেন? তোর চিঠি আমি দেখতে চাই?

ইলা। দেখালে তো! (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ! আমার চিঠি ওঁকে দেখাবে! আবদার!

কালিন্দী। (উদাসীন হইবার চেষ্টা করিয়া) লিখেছে—কাল শনিবারই জানতে পাবে কোথায় ওর 'পোস্টিং' হবে। ও বেঙ্গল-ই বেছে নিয়েছে। ময়মনসিঙে ফার্স্ট য়্যাপয়ণ্টমেণ্ট হলে খুব ভালো হয়—কেন না—

ইলা। কেন না!—

কালিন্দী। কেন না, আমি বিদ্যাময়ী-স্কুলে চাকরি পেয়েছি।

ইলা। (গম্ভীর হইয়া) ও-সব প্রাইভেট য়্যাফেয়ার সম্বন্ধে কিছু আমি বলবো না এখন। যাকে-তাকে আমাদের কথা বলে বেড়ানো ও নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না।

কালিন্দী। ওর সম্বন্ধে অত সব ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপার জানবার আমার কৌতূহলও নেই, সময়ও কম।

ইলা। (এ-সব কথা যেন গ্রাহ্য করিবার মত নয়) আমাকে লিখেছে—মুগের ডাল করে রেখো, লাউশাকের ডগা দিয়ে। ভারি খেতে ইচ্ছে করছে।

কালিন্দী। আমাকে লিখেছে—পুঁইশাকের চচ্চড়ি করে রেখো চিংড়ি মাছ দিয়ে; কত দিন খাই নি।

ইলা। উঠবে তো এসে এখানে। তোর রান্না খাবে কখন?

কালিন্দী। কেন? রাত্রে।

ইলা। (যেন জিতিয়াছে) রাত্রে! তাই বল্! আমি তখন ওকে এত খাইয়ে দিয়েছি যে রাত্রে ওর খিদেই থাকবে না। তখনো আমার রান্নার ঢেঁকুর তুলছে!

কালিন্দী। ওর রাত্রে খিদে থাকবে না—সেই তো হবে মজা। আমার আর 'মাইনস-সিক্স' চোখ নিয়ে কষ্ট করে রাঁধতে হয় না। বাবাঃ, বাঁচলাম! এই কাঠফাটা রোদ্দুরে তোর বাড়ি থেকে যা-তা কতগুলি খেয়ে বেচারা শ্রান্ত হয়ে আমার বাড়ি শু'সবে—ঠিক সন্ধের সময়। আমি ছাদে ওর জন্যে শীতলপাটি পেতে রাখব; (মুগ্ধভাবে) দখিন হাওয়া এসে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

ইলা। ঘুম না হাতি!

কালিন্দী। যা-তা কতগুলো খেযে এসে যদি ওর ঘুম না-ই আসে, এক ফোঁটা পাল্‌সেটিলা থার্টি খাইযে দেব। চোঁয়া ঢেঁকুর থেমে যাবে।

ইলা। (একটু গর্বিত) তবু তোর হার, পোড়ারমুখি!

কালিন্দী। কিসে?

ইলা। আগে এসে উঠবে আমারই বাড়ি, আমারই এ ঘরে। আমারই সঙ্গে ওব প্রথম কথা।

কালিন্দী। হোক না প্রথম কথা। সে-কথার 'ভ্যালু' কি? সে কথা তো—বম্বে মেইল পাঁচ ঘণ্টা লেইট, গোণ্ডিয়ায় এঞ্জিন 'ডিরেইলড' হযে গেল; বিলেত-দেশটা আগাগোড়া মাটির, অনেকটা ডালহৌসি স্কোযারের বর্ধিত সংস্করণ; বিলেতের মেযেরা হ্যানো করে ত্যানো খায়—এ-জাতীয় কথাবার্তা। কোথায় বা তাতে রস, আর কী-ই বা তার দাম!

ইলা। তুই তো তা বলবি-ই। কিন্তু, আমার ভাগে দুধের সর, দধির মাথা।

কালিন্দী। তোর নিজের মাথা! আর, আমার ভাগে ক্ষীর! তোর ভাগে দুপুর,—ভ্যাপসা গরম, আঁধি; আর আমার ভাগে রাত্রি—

ইলা। (কথা লুফিয়া নিয়া) ড্রেনের গন্ধ, মশা, মাকড়, ছারপোকা—

কালিন্দী। (কথা কাড়িয়া নিয়া) অর্থাৎ 'ইনসোমনিয়া'। তাই তো চাই, পোড়ারমুখি! জেগে-জেগে সারারাত কথা কইব—(কবিত্ব করিবার সুরে) সে-কথা বিলেত নিয়ে নয়, আকাশ নিয়ে। পৃথিবীতে জন্ম নেবার আগে কোথায় আমরা ছিলাম—সে-ই কথা ; মরবার পর কোথায় আবার আমরা যাব—সে-ই কথা।

ইলা। (হাসিয়া) বিয়ের কথা কিন্তু আগেই হয়ে গেছে—দুপুর বেলায়ই।

কালিন্দী। তা কি আর জানি না? সেই জন্যেই তো রাত জেগে আমাদের এত পরামর্শ! (হাসিয়া) বিয়ের কথা হয়ে গেছে, অথচ সেই বিয়ে ভেঙে দিতে হবে—কত খেসারৎ দেওয়া উচিত, মোকদ্দমা করবার রাস্তা না থাকলেও ইলাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কত টাকার একটা নেকলেস দেওয়া যায়, এই নিয়েই তো আমাদের সারা রাত ধরে ভাবনা!

ইলা। (বড় টেবিল হইতে একটা কাগজ লইয়া কালিন্দীর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া) দূর রাক্ষুসি!

কালিন্দী। (দার্শনিকের মতো) দুপুর বেলার বিয়ের কথা রাত্রে আবার কখন ভেঙে যায়, ইলা।

ইলা। ভাঙুক। (চঞ্চল) কিন্তু এখনো আসছে না! (ঘড়ি দেখিল) কি করা যায় বল্ তো?

কালিন্দী। কী আবার করা যাবে! এই তো দিব্যি গল্প করছি দু'টিতে মিলে। ও এলেই তো ভীষণ গোলমাল! দু'জনে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—লাউশাকে আর পুঁইশাকে ঝগড়া!

ইলা। ঠাট্টা নয়, কালি। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে।

কালিন্দী। নিশ্চয়ই। হয় ঠিক মতো স্টার্ট করেনি, নয় মাঝপথে আপ-ট্রেনের সঙ্গে কলিশন হয়েছে, নয়—

ইলা। (কৌতূহলী) নয়—?

কালিন্দী। নয় মেম নিয়ে ফিরেছে।

ইলা। (আকাশ থেকে পড়িয়া) মেম নিয়ে!

কালিন্দী। কিম্বা, আপাতত, মেম রেখেই ফিরেছে।

ইলা। অসম্ভব! 'প্লেজ' সে ভাঙবে না।

কালিন্দী। সে তো আমারো সান্ত্বনা।

ইলা। (চমকিত) তোরও?

কালিন্দী। এ-প্রশ্ন আমিই তোকে করতে যাচ্ছিলাম। (একটু চুপচাপ) যাই বলিস ইলি, অপ্রত্যাশিতের জন্যে আশা করে চেয়ে-থাকায় ভয় লাগে বটে, কিন্তু বিস্ময়ও লাগে! দুঃখ? তার সংজ্ঞা ঠিক দুঃখ নয়।

ইলা। (সন্দিগ্ধ) তোর সঙ্গে ওর কদ্দিনের আলাপ?

কালিন্দী। তোর সঙ্গে?

ইলা। (যেন একটা বলিবার বিষয় পাইযাছে) বছর তিনেক আগে, মানে ওর ট্রেনিং নেবাব জন্যে বিলেত যাবার এক বছর আগে। আলাপ হয়েছিল শিলিগুড়ি স্টেসনে ওযেটিংরুমে—দু'জনেই দার্জিলিঙ যাচ্ছিলাম। সে ভারি মজার গল্প!

কালিন্দী। (এবার কৌতূহলী) কি রকম?

ইলা। শিলিগুড়ি এসে খবর পেলাম দার্জিলিঙের পথে 'ল্যাণ্ডস্লিপ' হয়েছে। মাথার ওপর তখন দারুণ বৃষ্টি। মুখখানাকে মেঘলা করে ওযেটিং-রুমে এসে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি দু'টি ছেলে গলা ছেড়ে খুব হল্লা করছে। আমাকে দেখেও থামলো না, রীতিমত অপমানিত বোধ করলাম। পরে মনে হয়েছিল 'নার্ভাসনেস'! একটি ছেলে পাশের বন্ধুকে বলছে—বর্ষাতি মাথায় ফেলে পায় হেঁটেই চলে যাব দার্জিলিঙ; ট্রেনের তোয়াক্কা রাখিনে। শুনেছিস, কী দুঃসাহস ছেলে দু'টোর!

কালিন্দী। তক্ষুনিই প্রেমে পড়ে গেলি ?

ইলা। পাগল! তখন তো ও সবে হিস্‌ট্রিতে এম-এ পড়ছে। আই-সি-এস ও স্বপ্নেও হয়নি।

কালিন্দী। (কিছু না বুঝিয়া) তাতে কি ?

ইলা। (ভারিক্কি চালে) খালি-পেটে আর যারই পূজো চলুক, প্রেমের চলে না—অন্তত আমি পারিনে। হিস্‌ট্রিতে এম-এ পাশ করে কী করত ? হয় ওকালতি পড়তে যেত—রাসবিহারী না হয়ে হত ঘাসবিহারী! কিম্বা বড় জোর মাস্টারি—তা-ও বি-টি পাশ করতে না পারলে তো কথাই নেই—খালি ধনুক ভাঙতে পারলেই সীতা পায় না, ব্যাঙ্কে চেক ভাঙাবারো মুরোদ থাকা চাই। কি বল্ ?

কালিন্দী। বুঝলাম। তারপর ?

ইলা। হ্যাঁ; তারপর-ই হল মজা। বেয়ারা ট্রে-তে করে ওদের চা দিয়ে গেল, আমারটা পরে আসছে। আমাদের ভ্যাবা-গঙ্গারাম—এখন অবিশ্যি নয়—'পট' থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে গিয়ে হাত থেকে দিলে ফেলে। ট্রে-শুদ্ধ সব মেঝেতে ভূমিসাৎ। পেয়ালাগুলো ভেঙে চৌচির—চা পড়ে ওর জামা-কাপড়—

কালিন্দী। (বিরক্ত) আমি 'স্ট্যাটিসটিকস' চাই না। তুই করলি কী ?

ইলা। হো হো করে হেসে উঠলাম।

কালিন্দী। (ভেঙচাইয়া) হো হো করে!

ইলা। পেট ফেটে হাসি!—সোডার বোতলের মুখ ছুটে গেলে যেমন হয়। ছেলেটা ভাই ভীষণ গোঁয়ার। এল আমাকে তেড়ে; বললে, হাসছেন যে ? পরের 'ডিসকমফিচার'-এ হাসতে লজ্জা করে না ?

কালিন্দী। (যেন পুলকিত) বললে!

ইলা। আমি-ও ছাড়লুম না। রীতিমত ঝগড়া বাধিয়ে দিলুম। কিন্তু এমনি আশ্চর্য, সেই ঝগড়া থেকেই গভীর ভাব হয়ে গেল। বৃষ্টি

থামলে দু' জনে দু' ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে বেড়ালুম—ঠাণ্ডা আকাশ, গরম চা, রঙিন গাল—রীতিমত ও আমার প্রেমে পড়ে গেল!

কালিন্দী। রীতিমত?

ইলা। তা ছাড়া আবার কি? দার্জিলিঙে আমার একা বেড়াতে আসাকে প্রশংসা করলে—আমার দৈর্ঘ্য, আমার 'গেইট', এমন কি আমার 'স্মোক' করা পর্যন্ত। বললে, দার্জিলিঙ ঘুরে এলাহাবাদ যাচ্ছে, আই-সি-এস দেবে। রীতিমত লাফিয়ে উঠলাম।

কালিন্দী। রীতিমত! I see ass! তা, তুই কবে প্রেমে পড়লি?

ইলা। কলকাতায় ফিরে এসে ও-সব কথা আমার কিছু মনেই ছিল না—

কালিন্দী। (গম্ভীর হইয়া) কলকাতায় ফিরে এসে দার্জিলিঙের কথা আমরা ভুলেই থাকি!—পৃথিবীতে এসে অমর্ত তারার কথা আমাদের মনেই থাকে না!

ইলা। তার মানে?

কালিন্দী। পরে বলছি। হ্যাঁ, তুই কবে প্রেমে পড়লি?

ইলা। যেদিন গেজেটে দেখলাম ও সবার মাথায় এসে উঠেছে। ভারি গর্ব বোধ করলাম; মনে হ'ল—আমার জন্যে ও বিশ্বজয় করতে পারে।

কালিন্দী। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন করতে পারে না।

ইলা। (কথা কানে না তুলিয়া) আট পৃষ্ঠা ভরে ওকে চিঠি লিখে ফেললাম। কলেজ ছেড়েছি পর আর 'এসে' লিখিনি। 'ইনভারটেড কমা'র মধ্যে তোর রবি ঠাকুরের কবিতা 'কোট' করে দিলাম পর্যন্ত। জবাব যা এল তা তোকে আর বলবো না। উঁহুঁহ্!

কালিন্দী। সেই তোর প্রথম প্রেম?

ইলা। না, দ্বিতীয়। প্রথম প্রেম হয়েছিল যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

সেই ছেলেটার নাম গোবিন্দ কি গণেশ হবে, মনে নেই। ভীষণ পড়ত—বইয়ের পোকা ছিল। হল-ও তাই, বুকে এসে পোকা বাসা বাঁধলো।

কালিন্দী। (মনোযোগী) কী পড়ত? আই-সি-এস-এর পড়া?

ইলা। মুণ্ডু! তা হলে তো বুঝতাম। সাড়ে চার শো-য় স্টার্ট—কী না হওয়া যায় তার পর? তা তো নয়, দিন-রাত 'গোগোল', 'গোগোল' করত। গোগোল যে লোকের নাম তা-ই আমি কোনো দিন সন্দেহ করিনি। 'পুশকিন' শুনে মনে করেছিলাম কোনো নতুন মদের নাম বোধ হয়। ছেলেটা পড়তে-পড়তেই মারা গেল। (হাসিয়া) আই-সি-এস তো নয়, থাইসি—স!

কালিন্দী। (আহত) মরে গেল। তবু তার নাম গোবিন্দ কি গণেশ, মনে নেই!

ইলা। বয়ে গেছে। (হাসিয়া) আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। এবারে তোর কথা বল। কদ্দিন আলাপ ওর সঙ্গে?

কালিন্দী। ছিলাম মানিকগঞ্জ—

ইলা। (থামাইয়া) কদ্দিন আলাপ?

কালিন্দী। তাই তো বলছি। ছিলাম মানিকগঞ্জ—

ইলা। (ব্যস্ত হইয়া) কদ্দিনেব আলাপ তাই বল্ না। বাজে কথা শুনে কী হবে?

কালিন্দী। আরে মর! তাই তো বলছি। ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ স্টিমার করে—

ইলা। চুলোয় যাক তোর মানিকগঞ্জ।

কালিন্দী। (গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া) তা হলে সত্যিই ভীষণ সিরিয়াস হয়ে যাব। বলে বসব—আমাদের আলাপ যুগ-যুগ ধরে (কবিত্ব করিয়া) আকাশের প্রথম জন্মদিন থেকে। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) উপযুক্ত গাম্ভীর্য নিয়ে দুপুর বেলায় এ-কথাটা কেমন যেন মানায় না!

ইলা। (ঠাট্টার স্বরে) সেই তোর প্রথম প্রেম? কিন্তু, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে কী করবি?

কালিন্দী। সোজা বিদ্যাময়ী-স্কুলে গিয়ে মাস্টারি নেব। তখনই সেই হবে আমার শেষ প্রেম—পরম প্রণতি! (ধীরে) কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে—

এই কথার উত্তর দেওয়া হইল না। একটা মোটর আসিয়া নিচে রাস্তায় দাঁড়াইল ও ঘন-ঘন হর্ন বাজিতে লাগিল। ইলা ছুটিয়া জানলায় নিচু হইয়া মুখ বাড়াইল। কালিন্দীও উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইলা। (জানলা হইতে) থেমেছে—গাড়িটা আমাদের বাড়িতেই থেমেছে। এসেছে বুঝি।

কালিন্দী। (তাড়াতাড়ি জানলায় গিয়া ইলাকে টানিয়া ফিরাইয়া) নিচু হয়ে আর তীর্থকাকের মতো মুখ বাড়িয়ে থাকে না। আসুক সে! আমার কথার জবাব দে, রাক্ষুসি। আমার সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হয়—তা হলে—

ইলা। (চঞ্চল) আমার বুক কি রকম কাঁপছে। হাত দিয়ে দেখ—

কালিন্দী। পরে দেখলেও চলবে। আমার কথার জবাব দিয়ে নে। যদি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তা হলে কী করবি? বল্ না।

ইলা। এমনি করবি তো ভীষণ সিরিয়াস হয়ে যাবো। আয়, দু'জনে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকি—দেখি কাকে এসে আগে ছোঁয়! বোস্।

দু'জনে পাশাপাশি লম্বা সোফাটায় বসিল। এক মুহূর্তের নীরবতা।

কালিন্দী। যদি ঘরে ঢুকেই দু'জনের নাম ধরে চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে আগে!

ইলা। তবু চোখ চাইব না। নিশ্চয়ই ওকে ছুঁতে হবে।

কালিন্দী। তা হ'লে বাপু, তুমি এখানটায় বোসো। আমি দরজার কাছে থাকবো। (হাসিয়া) যাকে আগে ছোঁবে তারই তো!

ইলা। তা কেন? আচ্ছা, বেশ, দরজা থেকে সমান দূরত্ব রেখে এই চেয়ার দুটোয় বসি, আয়। (দু'জনে চেয়ার দুটো টানিয়া বসিয়া পড়িল) চোখ বোজ্ এবার। (চোখ বুজিল)

কালিন্দী। (চোখ বুজিয়া ফের মেলিয়া) যদি আমরা ঘুমিয়ে আছি বলে—ডাকাডাকি করে সাড়া-শব্দ না পেয়ে চলে যায়? এই, চোখ মেলছিস যে!

ইলা। কি করে তুই টের পেলি যে চোখ মেললাম! (ফের দু'জনে চোখ বুজিল) যদি চলেই যেতে হয়, তখন না হয় চোখ থেকে চোখা-চোখা বাণ ছোঁড়া যাবে।

কালিন্দী। (নিমীলিতচক্ষু) চোখ বুজে বসে-বসে আমার কথার জবাবটা তৈরি করে নে, পোড়ারমুখি। (আস্তে) যদি আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়—এই আষাঢ়ে, এক মেঘ-মন্দ্রিত গোধূলিতে!

ইলা। (খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর, চোখ মেলিয়া) এখনো যে কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না। ব্যাপার কি? চোখ চা, কালি। (কালিন্দী তবু চোখ মেলিল না) ঘুমিয়ে পড়লি নাকি লো? (তবুও না) মোটরটা কি ভুল করে আমাদের দরজায় থেমেছে? না, নিচে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে? চল, নিচে যাই।

কালিন্দী। (চোখ বুজিয়াই) 'ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড' ইলা। এতক্ষণ প্রতীক্ষার পর ধৈর্যের এই পরীক্ষাটুকুও সইবে। জল হয়ে নিচে গড়িয়ে পড়িস নে।

ইলা। (শশব্যস্ত) সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এলো!

কালিন্দী। (সুর করিয়া) খুকু ঘুমুলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গি এলো দেশে!

ইলা। কথা নয়; চোখ বুজে থাক।—ওয়ান, টু, থ্রি।

দু'জনে চোখ বুজিল। গভীর স্তব্ধতা। সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সহসা—অপর সঙ্গিনীটি চোখ বুজিয়া আছে কি না দেখিবার জন্য একসঙ্গেই দুইজনে চোখ মেলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কালিন্দী। এই চোর!

ইলা। আচ্ছা, এইবার। 'ওয়াড´ ইজ ওয়াড´' কালি। ওয়ান, টু, থ্রি।

দুইজনে ফের চোখ বুজিল। জুতোর শব্দ দরজার নিকটবর্তী হইল। দরজা দিয়া যে ঘরে প্রবেশ করিল, সে পুরুষ নয়—পুঁটু, বছর আঠেরোর একটি পাতলা, চঞ্চল মেয়ে। পরনে খদ্দর-শাড়ি, গায়ে খদ্দরের ব্লাউজ—পায়ে একটা শাদা রঙের কটকি চটি। পিঠে বেণী ঝুলিতেছে বলিয়া আরো কম বয়স বলিয়া ভুল হয়। দুটি হাতে মাত্র একগাছি করিয়া চুড়ি, আর্টিস্ট বটিচেলি সাধারণত যে-সব মেয়ে-মুখ আঁকিয়াছেন, পুঁটুর মুখাবয়ব কতকটা সেই ধরনের, একটু চ্যাপটা। এক কথায়, মেয়েটি ভারি সাদাসিধে।

পুঁটু ঘরে ঢুকিয়া এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

কালিন্দী। (চোখ বুজিয়াই, তাড়াতাড়ি) শিগগির আমাকে ছুঁয়ে ফেল। (হাত বাড়াইয়া) শিগগির।

ইলা। (চোখ বুজিয়াই, ধমকের সুরে) ককখনো না। 'ওয়াড´ ইজ ওয়াড´' কালি। (নবাগতের প্রতি) তোমার যাকে ইচ্ছা তাকে ছোঁও।

পুঁটু। (একটু বিস্মিত, একটু উদ্বিগ্ন) এসেছেন?

কালিন্দী ও ইলা একসঙ্গে চোখ মেলিয়া বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক, যেন নিস্পন্দ হইয়া রহিল। এই প্রগাঢ় প্রতীক্ষার পর এই হতাশা দুঃসহ। এক মিনিট সুগভীর নিস্তব্ধতা। কালিন্দী পাথরের মতো স্পন্দহীন; ইলা হতাশার ভঙ্গি করিল।

পুঁটু। আসেন নি এখনো?

কালিন্দী। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) এই যে, পুঁটু! তুমি কোত্থেকে? তোমাদের চেনা নেই বুঝি? এস, তোমাদের আলাপ করিয়ে দি। (ইলার প্রতি) ইনি পুঁটু—ভীষণ খদ্দরিস্ট কল্যাণী দেবীর নাম শুনেছিস

আশা করি। আর, (পুঁটুর প্রতি) ইনি আমার বন্ধু শ্রীমতী ইলা দেবী—তোর কি কি কোয়ালিফিকেশন বল না। (পুঁটু ইলাকে উদ্দেশ করিয়া নমস্কার করিল ; ইলা নড়িল না—মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। পুনরায় পুঁটুর প্রতি) হঠাৎ, এইখেনে তুমি ?

পুঁটু। এখনো আসেন নি বুঝি ? কাল বিকেলে চিঠি পেলাম আজ সকালে কলকাতা পৌছুবেন। সকালে ছাত্রী-সমিতির একটা 'এমারজেন্সি' মিটিং ছিল বলে স্টেশনে যেতে পারি নি। চিঠিতে আমাকে এ-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এইখেনে দেখা করতে বলেছেন। আসেন নি এখনো ?

কালিন্দী। টু লেট ! এসে, ইলার রাঁধা লাউশাক খেয়ে চোঁয়া ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে আমাদের বাড়ি গেছে পাল্‌সেটিলা খেতে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো। ফ্যানটা আরো বাড়িয়ে দে, ইলা। (পুঁটু লম্বা সোফটার একধারে বসিল।)

ইলা। (দারুন বিরক্ত) আমার বাড়ি কি একটা খোঁয়াড় নাকি যে সবাই এসে এখানে মাথা গলাবে ? (রাগ)

কালিন্দী। বেচারার খরচ বেঁচে যায়, পরিশ্রমও। তাই এক জায়গায় সবাইকে জড়ো করতে চেয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে খুব 'শাইন' করবে, দেখিস। পাকা খেলোয়াড়। (পুঁটুর প্রতি) আর কে কে আছে পিছে ? পথে আর কাউকে দেখলে ? (হাসি)

ইলা। আপনার যদি ওর সঙ্গে কোনো দরকার থাকে, বলে যান ; ঠিক সময়ে জানানো হবে।

পুঁটু। ঠিক বলবার মতো নয়। দেখা হলে--

ইলা। বেশ ; বলবার মতো না হলে একটা 'স্লিপে' লিখে রেখে যান।

পুঁটু। আমার দুর্ভাগ্য, তা লেখবার মতোও নয়। দেখা হলে একটু

বইরে নিয়ে যেতাম। আমার মোটর দাঁড়িযে আছে। এখনো না আসবার মানে? আজকে তো ওঁর আসা চাই-ই। (ব্লাউজের ভিতর হইতে স্বদেশী নিশানওয়ালা খদ্দরের রুমাল বাহির করিয়া কপালের ও ঘাড়ের ঘাম মুছিল।)

ইলা। আপনার ফরমাস-মতো?

কালিন্দী। (উঠিয়া ফ্যানের রেগুলেটারটা আরো বাড়াইয়া দিয়া) আমাদের সবার ফরমায়েস মতো। (পুঁটির প্রতি) তুমি ওকে আবার কবে দেখলে? কোথায়?

পুঁটি। (একটু হাসিয়া) আমি ওঁকে আজো দেখি-ই নি।

ইলা। তবে?

কালিন্দী। 'খালি বাঁশি শুনেছি?'

পুঁটি। চিঠিতে ওঁর সঙ্গে আলাপ। কাগজের মধ্যে দিয়েই দৃষ্টি-বিনিময়।

ইলা। চিঠি? আপনাকেও চিঠি লেখেন না কি? প্রেমপত্র?

পুঁটি। প্রেমপত্র বললে অর্থটা খাটো, বিস্বাদ হয়ে যাবে। আমার দেশের কাজের প্রশংসা করে তিনি চিঠি লিখেছেন।

ইলা। দেশের কাজ! এ বলে কি কালি! ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আপনাদের এ হুলুস্থুল কাজের প্রশংসা করবেন।

পুঁটি। (জোরের সঙ্গে) নিশ্চয়। যদি আমাকে তিনি চান—

কালিন্দী। যদি তোমাকেও চায়—এ বলে কি, ইলি।

পুঁটি। হ্যাঁ, যদি আমাকে তিনি চান—আমার হাত ধরে তাকে পথে নেমে আসতে হবে—কণ্টকাকীর্ণ পথে, যে পথের প্রান্তে ত্যাগ আর ক্ষতি, আঘাত আর অপমান।

ইলা। (চটিয়া) সংযত হয়ে কথা বলুন। আমার বাড়িতে বসে একজন অফিসারের বিরুদ্ধে এ 'স্ল্যাণ্ডার' আমি সইবো না। তোমার বন্ধুকে ভদ্রতা শিখতে বলো, কালি।

কালিন্দী। (সহজ করিবার চেষ্টায়) তোমার সঙ্গে পথে বেরুবে কি পুঁটু—সে 'অলরেডি' তার ফিরিঙ্গি সহচরীকে নিয়ে বেলুনে বেরিয়েছে। একসঙ্গে তিনজনকেই কলা দেখালো। তিন-ই বা বলি কি করে? হতে পারে তিন শো তিন! সরদা-বিলের পর বাঙলা দেশে আর কত কুমারী আছে, ইলা?

পুঁটু। অসম্ভব! এ আমি ককখনো বিশ্বাস করিনে।

কালিন্দী। তোমার বিশ্বাসের কত দূর দৌড় শুনি?

পুঁটু। আমি তাকে যত দূর চিনি, আপনারা তাঁর একবিন্দুও জানেন না। তিনি স্বাধীন, নির্ভীক, নিদারুণ। তিনি পরপদলেহন করতে শেখেননি।

ইলা। তোমার বন্ধুকে চলে যেতে বলো, কালি। এখেনে আমরা ডেমাগগ'-এর বক্তৃতা শুনতে বসিনি।

কালিন্দী। অর্থাৎ, সে তোমারই হাত ধরে পথে নেমে আসবে—জুতো খুলে, পথের কাঁটা খাবার জন্যে। তোমার আবদারের মৌলিকতা আছে, পুঁটু! (সোফায় বসিল)

ইলা। এরি জন্যেই সে এত কষ্ট করে আই-সি-এস হয়েছে।

পুঁটু। নিশ্চয়; এরি জন্যে [illegible]কে, ক্ষুদ্র স্বার্থকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্যে।

কালিন্দী। তোমার তো 'সখের প্রাণ গড়ের মাঠ' দেখছি। বলি, আমরা কি দোষ করলাম? ইলা কী দোষ করলো? এমন চমৎকার যে 'স্মোক্' করতে পারে ধোঁয়ায় যে 'কাল' দিতে পারে—সিগ্রেটের একপ্রান্তে আগুন, অন্য প্রান্তে যার ঠোঁটের রঙ লাগানো—সেই ইলার অপরাধ কি শুনি? আর আমি—যার সঙ্গে ওর যুগ-যুগ ধরে আলাপ, আকাশের প্রথম জন্মদিন থেকে—আমিই বা এমন কী ফ্যালনা হ'লাম? আমার সম্বন্ধে এ-কথাগুলি উপযুক্ত গাম্ভীর্য নিয়ে দুপুর বেলায় ঠিক বলা যায় না।—মুস্কিল!

পুঁটু। আমাকে চলে যেতে বলছেন বটে—কিন্তু এখুনিই আমি যেতে পারবো না। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে।

ইলা। তবে নিজের বাড়িতে বসেই প্রতীক্ষা করুন গে।

পুঁটু। প্রতীক্ষা করবার মতো আমার অপর্যাপ্ত সময় নেই। বেশ, আমি উঠছি। (উঠিয়া) যাঁর এমন সব বন্ধু তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আমার অশ্রদ্ধা হচ্ছে।

কালিন্দী। আমাকেও 'ইনক্লুড' করছ না কি?

ইলা। (ক্ষিপ্ত) চরিত্র! আপনি চরিত্র তুলে কথা বলছেন? কার বাড়িতে বসে আছেন, জানেন?

পুঁটু। জেনে আমার কাজ নেই। সংসর্গ থেকেই লোককে বোঝা যায়। ছি!

কালিন্দী। তেমনি আমাদেরও ওর সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করা উচিত, পুঁটু। তোমার সঙ্গে না মিশলেও পরিচয় রাখছে তো—এবং তোমার দেশের নামে এই গোঁয়ারতুমিকে নিশ্চয়ই প্রশ্রয় দিচ্ছে। ওর সম্বন্ধে আমাদেরো শ্রদ্ধা হারাবার কি কারণ ঘটেনি?

ইলা। (সঘৃণ) ছি।

কালিন্দী। সে খাঁটি সাহেব—ম্যাজিস্ট্রেট। তোমার এই মোটা খদ্দরকে বরদাস্ত করবে না।

ইলা। পা-পোষ বানাবে।

কালিন্দী। যাও—দেশের কজে করো গে।

পুঁটু। তা তোমাদের আর বলতে হবে না। দেশ—কথাটা তোমাদের কাছে উল্লেখ করতেও আমার লজ্জা করে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—তোমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে আমার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে।

ইলা। (চমকিত) এঁ্যা! এ বলে কি, কালি?

কালিন্দী। কক্‌খনো না। তার রুচি এত 'ডিপ্রেভড' হয় নি। আসুক সে।

পুঁটু। তিনি এসেছেন, এবং আমার বাড়িতেই আছেন। তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। খাঁটি সাহেবকে একবার দেখবে এস। (চলিয়া যাইতে উদ্যত)

কালিন্দী। এ বলে কি, ইলি ?

ইলা। চলে যায় যে ? যাবি নাকি ওর সঙ্গে ?

কালিন্দী। (অপস্রিয়মান পুটুর প্রতি) দাঁড়াও, একটু 'স্মোক্' করে যাও। (পুটুর প্রস্থান) খুব 'স্টান্ট' দিলে যাহোক। (ভালো হইয়া বসিয়া) আসুক সে।

ইলা। রীতিমত বোঝাপড়া করতে হবে।

কালিন্দী। ফের রীতিমত ! সে আর আসবেই না।

ইলা। ইস, আসবে না ! চল, ওর বাড়ি যাই ; ঠিকানা জানিস ?

কালিন্দী। তুই ভারি ছোটলোক হয়েছিস। 'বিহেভ' করতে পর্যন্ত শিখিসনি। ছি ! পুঁটুকে শুধু-শুধু চটিয়ে দিলি। ও এলে আমি ওকে সব কথা বলে দেব। (আবার একটু নড়িয়া-চড়িয়া) আসুক সে।

ইলা। আর, তুই-ই খুব ভদ্রলোক হয়েছিস ! তোর কাছ থেকে আমার 'ম্যানার্স' শিখতে হবে ? আমার 'স্মোক্' করার কথা ওকে বলবার কী দরকার ছিল ? আবার নালিশ করবার ভয় দেখাচ্ছিস ? তোর নালিশের 'ভ্যালু' কি ?

কালিন্দী। 'স্মোক্' করতে পারিস, বলতে পারবো না ? একশো বার বলব। আমি কি তোর হুকুম তামিল করতে এসেছি নাকি যে কি বলবো বা কি বলবো না তোর কাছ থেকে শিখে নিতে হবে ? আমার মুখে যা আসে তাই বলবো।

ইলা। আমারো মুখ আছে।—আমিও থুতু ছিটোতে পারি।

কালিন্দী। জানি। মুখ আছে বটে—মাথা নেই। তাই অভ্যাগতকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার মতো অসভ্য হতে পারিস।

ইলা। মুখ সামলে কথা বলিস, কালি। আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, বেশ করেছি। একশো বার দেব। আমার বাড়িতে 'সিডিশন' আমি সইবো না।

কালিন্দী। তুই কি নির্লজ্জের মতো মেমসাহেব হচ্ছিস। শাড়ির ঝুলটা হাঁটুর ওপর করে উঠবে?

ইলা। এ অন্তত বাপের বাড়ি হচ্ছে বলে রাখছি। আসুক সে।

কালিন্দী। হ্যাঁ, আসুক সে।

ইলা। আচ্ছা, আসুক সে।

কালিন্দী। আসুক সে।

ইলা। বেশ, নিজের বাড়িতে বসেই গাল-পিত্তোস কর গে। (উঠিয়া ফ্যান বন্ধ করিয়া) অনেক হাওয়া খেয়েছিস।

কালিন্দী। বাকিরে আমাদের বাড়িতে তোর নেমন্তন্ন রইলো। বিলেত থেকে আর তো দেশে ফিরেছে—তার ওর সম্মানে একটা টি-পার্টি দেব। তুই যাস—টেবিল সাফ করবি। আমাদের বাড়িতে ঝি নেই।

ইলা। মুখ সামলে কথা বলিস, বলছি।

কালিন্দী। আর, শাড়িটা কিন্তু হাটুর ওপর তুলে যাস—নইলে, সেই ঝি আমাদের পছন্দ হবে না।

ইলা। (দারুন চটিয়া) তুই যা শিগগির আমার বাড়ি ছেড়ে।

কালিন্দী। যাব না তো।

ইলা। আচ্ছা, আসুক সে।

কালিন্দী। আসুক সে! কী করবি তুই না গেলে? এই ফের

বসলাম। (সোফায় বসিল) আসুক সে;—আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে!

ইলা। শিগগির যা বলছি, নইলে ভয়ানক চ্যাঁচাবো।

কালিন্দী। কী বীরত্ব! 'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি, খাসা তোর চ্যাঁচানি'! ছি!

ইলা। (মেঝেতে জুতা ঘসিয়া) গেলি? এটা আমার বাড়ি, মনে থাকে যেন।

কালিন্দী। (উঠিয়া) বেশ, যাচ্ছি। তুইও আয় না আমার সঙ্গে। ও একা-একা দুপুর বেলাটিতে চুপ করে শুয়ে-শুয়ে নিশ্চয়ই ঘামছে। ওর আবার দুপুর বেলা ফ্যানের হাওয়া পছন্দ হয় না—গরম লাগে। তুই চল না, ওর শিয়রে বসে ওকে একটু পাখার হাওয়া করবি। আমার ঘুম পেলে আমি যদি ওর পাশে ঘুমিয়ে পড়ি—তা হলে আমাকেও।

ইলা। তার চেয়ে তুই একটুখানি দাঁড়া, আমি ওকে পাশের ঘর থেকে ডেকে আনছি। তুই এখানে আসবার আগে কোন সকালে ও যে আমার কাছে এসেছে তা তো আর জানিস না? দাঁড়া, ডেকে আনছি ওকে। ভারতবর্ষে নেমেই ওর পায়ে বাত হয়েছে—তুই ওর পায়ের তলায় বসে পা টিপে দিবি। দরকার হলে আমারটাও। বকশিস দেব।

কালিন্দী কি বলিতে যাইতেছিল, নিচে রাস্তায় মোটরের হর্ন শোনা গেল। ইলা ও কালিন্দী দুইজনেই স্তব্ধ, উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল—কেহও নড়িল না। আবার হর্ন শোনা গেল—দুইজনেরই মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হর্ন আবার! এইবার কালিন্দী ছুটিয়া গিয়া জানলায় ঝুঁকিয়া পড়িল।

কালিন্দী। এসেছে! ও এসেছে এবার। উলু দে, ইলি!

ইলা। (নির্বিকার) আসুক সে! তুই আমাকে কী অপমান করেছিস, সব বলব ওকে।

কালিন্দী। আর, আমিও কিছু ছাড়বো না। তুই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিস!

ইলা। তুই আমাকে ঝি বলেছিস—প্যাঁচানি বলেছিস।

(মোটরের হর্ন শোনা গল)

কালিন্দী। (চঞ্চল) আমি যাই ছুটে নিচে—আগেই ওকে 'রিসিভ' করে আনি গে।

ইলা। (কালিন্দীর হাত ধরিয়া ফেলিয়া) না, খবরদার। আমার বাড়ি।

কালিন্দী। আচ্ছা। 'নো হ্যাণ্ডিক্যাপ'। এখানেই আসুক সে। ফের চোখ বুজবি, ইলা?

ইলা। না।

কালিন্দী। (বন্ধুর মতো) এখন নাই বা আর ঝগড়া করলাম। ও আসছে, এক্ষুনি সিঁড়িতে ওর জুতোর শব্দ পাওয়া যাবে। আয়, এই সোফাটায় ফের পাশাপাশি বসি—বন্ধুর মতো। দু'জনে একত্র হয়ে ওকে শাসন করব। সামান্য 'পাঙ্কচুয়ালিটি' শেখেনি, ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। 'উই আর ফ্রেণ্ডস', ইলা।

ইলা। (নরম হইয়া) বেশ, আয় তবে আবার চোখ বুজি। ওয়ান, টু, থ্রি। (দুইজনে চোখ বুজিল)

(আধমিনিট কাল নিস্তব্ধতা)

ইলা। সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস কালি?

কালিন্দী। হ্যাঁ, পাচ্ছি। আর একটু পরেই—

ইলা। পাচ্ছিস? আমি তো পাচ্ছি না।

কালিন্দী। কান থাকা চাই।

(আরও আধমিনিট কাটিল)

ইলা। জুতোর আওয়াজ পাচ্ছিস, কালি?

কালিন্দী। পাচ্ছি বৈ কি।

ইলা। (আরো উৎকর্ণ) কোথায় ?

কালিন্দী। মনে হচ্ছে যেন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে।

ইলা। (চোখ মেলিয়া) এ্যাঁ, বলিস কি ? নেমে যাচ্ছে ! দোর-গোড়ায় এসে নিচে নেমে যাচ্ছে ! বলিস কি ?

কালিন্দী। তাই তো মনে হলো। (একটু গম্ভীর) চলে যাচ্ছে—তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস না ?

ইলা। সিঁড়িতে ?

কালিন্দী। তোর মাথায় !

ইলা। চল, নিচে যাই—ওকে ডেকে আমি। ও এত কাছে এসে কেন ফিরে চলে যাবে ? (চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল)

কালিন্দী। (ইলার হাত ধরিয়া ফেলিয়া) 'নো হ্যাণ্ডিক্যাপ', ইলা। দাঁড়া। আসুক সে।

ইলা। (উদাস) কোথায় ?

যবনিকা

পূর্বরাগ

পাত্র-পাত্রী

রুনু

রমেশ

মেজকাকা

দৃশ্য : দোতলায় রুনুর পড়ার ঘর। সময় : দুপুর দুইটা বাজিতে সতেরো মিনিট বাকি,—বাঙলা ১৩৩৪-এর চৈত্র মাস।

ঘরটি ছোট, পরিচ্ছন্ন। দক্ষিণের জানালা খোলা, তাহারই দেয়াল ঘেঁসিয়া একটি ছোট টেবিল—তাহারই উপর রাশীকৃত বই খাতা সাবানের বাক্স টিফিন-কেরিয়ারের বাটি চিঠির খাম সেফটিপিনের পাতা ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তরের দেয়ালে জগদ্ধাত্রীর একটি ছবি, পূবের—জিন্নানের। পশ্চিমের জানালা দুইটা বন্ধ, রোদ আসে।

নির্জন প্রশান্ত ঘরটি—সম্প্রতি চুনকাম করা হইয়াছে। স্তব্ধ অপরিমিত অবকাশ, রোদে আকাশ ফটফট করিতেছে। একটা পাখিও উড়িতেছে না।

পূবদিকের দুয়ারে পরদা সরাইয়া রুনু ঘরে ঢুকিল। কৃশ ললিতা,—মেয়েটি প্রথম প্রেমের কবিতার মত ভীরু, অবস্ফুট—দেখিলে মায়া করিতে সাধ হয়। দু'টি হাতে এক গাছি করিয়া চুড়ি, গলায় একটি সরু সুতলি, সব সোনার। খালি পা—কবেকার আলতার দাগটুকু আজিও উঠে নাই। পিঠের উপর চুল ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

রুনু খোলা চুলগুলি দুটি হাতে স্তূপীকৃত করিয়া লইতে-লইতে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিল। ললাটে উৎসাহের আভা, চোখে চঞ্চল একটি কৌতূহল—সমস্ত অবয়বে আনন্দের একটি অব্যক্তরাগ। কি-ভাবিয়া খোঁপাটা ফের খুলিয়া সারা পিঠে ছড়াইয়া দিয়া রুনু একখানি 'ডিডাকটিভ লজিক' লইয়া পাতা খুলিল। এক সপ্তাহ পরে তাহাকে আই-এ পরীক্ষায় বসিতে হইবে।

—

খানিকক্ষণ বিরাম। রুনু ধীরে-ধীরে পা দুলাইয়া-দুলাইয়া মনে-মনে পড়িতেছে। পাশের ঘর হইতে মেজকাকার ছোট একটি কাশির শব্দ শোনা গেল। আবার স্তব্ধতা।

রুনু। (বই হইতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে—বা হাতের আঙুলের কড় গুনিয়া-গুনিয়া—যেন জিন্নানের ছবিটার সঙ্গে কথা কহিতেছে) চারটে পর্যন্ত লজিক, তার পর মেজকাকাকে নিয়ে ইন্দিরাদের বাড়ি, তাদের লনে বসে আরেক কাপ, সেখান থেকে মেজকাকাকে ড্রপ, তার পর ইন্দিরাকে নিয়ে সিনেমা, সেখান থেকে মার্কেট, ওজন-নেবার জায়গার কাছে শীতাংশুবাবু (গদ্‌গদস্বরে—পুনরায়)—শীতাংশুবাবু—ইন্দিরার হঠাৎ কন্‌সাস হয়ে যাওয়া—একটু বা ঈর্ষা—হ্যাঁ, শীতাংশুবাবু—

ম্যাণ্ডোলিন—শীতাংশুবাবু আজ আমাকে ম্যাণ্ডোলিন কিনে দেবেন—তার পর—তার পর কি ?—(দুই গালে লজ্জার লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল ।)

হাতে একটা ব্যাগ লইয়া রমেশ ঘরের মধ্যে হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া ঢুকিল পড়িল। রমেশ গত ফাল্গুনে ছাব্বিশে পা দিয়াছে,—বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ত দেহ, কান্তিমান। পরনের জামা-কাপড়ে পরিচ্ছন্নতা নাই, জুতায় পুরু করিয়া ধুলা লাগানো। মাথায় চুল স্বল্প হইলেও রুক্ষ, দুইটি চোখে অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি, পাতলা দুটি ঠোঁটে খুশির রঙ লাগিয়াছে।

ইন্‌জিনিয়ারিঙ পাশ করিয়া রমেশ টাটানগরে লোহা পিটায়। তাহার মুখের কোথায় যেন এই লোহার দৃঢ়তার আভাস আছে—ধরা যায় না। রমেশের নাক দীর্ঘ ও বিস্ফারিত, ভুরু বিরল, চিবুক তেজোহীন। এই সব সত্ত্বেও চোখে বিদ্রূপের একটু হাসি মাখানো। সেই হাসিটি ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীণ।

রমেশ। (হাতের ব্যাগটা মেঝের উপর সশব্দে ফেলিয়া বাঁ হাতে ঘাড়ের ঘাম মুছিতে-মুছিতে) কী রোদ ! স্টেশনে বাস্-এর জন্য ঠায় পঁচিশ মিনিট দাঁড়িয়ে।

রুনু। (চমকিত, ভীত হইয়া) তুমি—কোত্থেকে হঠাৎ ? সদর দরজা খোলা ছিল ?

রমেশ। ভদ্রলোক অতিথি এলে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার একটা রীতি আছে, সে সমস্ত সৌজন্য শিখে রাখলে তোমার ভাল-ই হবে। ঘরে তো আর একটাও চেয়ার রাখনি—পা দু'টো এত ধরে আছে—লক্ষ্মীটি রুনু, খাটের ওপর তোমার বিছানাটা মেলে দাও না, একটু গড়াই !

রুনু। (চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া) কোত্থেকে এলে শুনি ?

রমেশ। (চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে) ধর না হনলুলু থেকে—তাতে কি ? এসেছি—এইটেই পয়েণ্ট। চৌবাচ্চায় জল আছে ? স্নান করা যাবে ?

রুনু। কেন আবার এলে ? জান, মেজকাকা আজ আফিসে যান নি—

রমেশ। (কথা লুফিয়া নিয়া) আফিসে যান নি? বেশ! কেন যান নি, রুনু?

রুনু। তাঁর দাঁতে অসহ্য ব্যথা, তিন-তিনটে দাঁত কাল ডেনটিস্টের কাছে গিয়ে তুলে ফেলতে হবে! জান, পাশের ঘরে তিনি এখন একটু চুপ করে শুয়ে আছেন, তুমি এসেছ শুনলে—

রমেশ। আবার তাড়িয়ে দেবেন? এবারে সহজে নড়ছি না রুনু, ঘাড়ের রগগুলি ইঞ্চি দুয়েক ফুলিয়ে ধরব। বলি, জল কি নেই? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

রুনু। তুমি চলে যাও, রমেশ-দা।

রমেশ। এ তো আর তোমার বাড়ি নয়, আর আমার ঘাড ধরাটাও তোমায় মানাবে না—যদিও সভ্য ভাবে ঘাড তুমি আমার বহুবার ধরেছ। বল কি, মনে নেই? সেই, প্রথমবার মেজকাকাই তো দেখে ফেলেছিলেন ইস্টিশানে ইণ্টার ক্লাশ ওয়েটিং-রুমের দরজার কাছে—তোমরা সদলবলে এলাহাবাদ যাচ্ছিলে। মনে নেই? মেজকাকা আমার সাক্ষী। ডাক তাঁকে।

রনু। (একটা খাতার পাতা ছিঁড়িতে-ছিঁড়িতে) মনে আছে বৈকি।

রমেশ। তাই যদি হয়, তবে,—হ্যা, তবে—ও কি, চমকাচ্ছ কেন? তোমাকে আমি ফের ঘাড় ধরতে বলছি না, ভয় নেই। ট্রেনের ধকলে আর কাঠফাটা রোদে মাথাটা আমার এত ধরেছে যে অসহ্য। একটু স্নান করবার বন্দোবস্ত করে দাও—গায়ের জামাটা খুলে ফেলব? অনুমতি দেবে?

রুনু। (বিব্রত হইয়া) কলে জল আসা পর্যন্ত তোমাকে তা হলে অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু তা আমি চাই না, রমেশ-দা, তুমি যাও।

রমেশ। বা রে! যাব বললেই কি যাওয়া যায়? তা হলে মরতে

চাই বললে মরাও ভারি সোজা হয়ে যেত। বেশ তো, জল নেই—স্নান নাই বা করলাম। তোমার ওরিয়েণ্টাল আঙুলগুলি দিয়ে কপালটা একটু টিপে দেবে, রুনু? আমি দেখব না, চোখ বুজে থাকব—তোমার ভয় নেই। তোমার গায়ের গন্ধ যদি নাকে এসে লাগে-ও, আমার ককখনো হাঁচি পাবে না, আমি বেশ নিশ্বাস নিতে পারব। (সামান্য উচ্ছ্বসিত হইয়া) তবু, আমাদের জীবনে এমন মুহূর্তও এসেছিল রুনু, যখন তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে—

রুনু। (গম্ভীর হইয়া) এই বাড়ির গৃহকর্ত্রী আমি নই; কাকিমা। তাঁকে আমি ডেকে আনছি। তিনি পাশের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। তাঁর আতিথ্যই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। (রুনু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।)

রমেশ। (রুনুর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া) তোমার কাকিমাকে আমার সামনে ডেকে আনলে তোমার মেজকাকার দাঁতের ব্যথা নিশ্চয়ই সেরে যাবে না—অতএব তুমিই আমার কাছে থাক, কাছে অর্থাৎ এই ঘরে। বেশি কিছু চাইছি না। স্নানের জল নেই, নাই থাক—কিছু খাবার দিতে পার? রান্নাঘরের হাঁড়িতে হাঁসের ডিম আছে? তাই গোটা কয়েক নিয়ে এস না। নেই? মুড়ি-টুড়িও নেই? তুমি কি হলে, রুনু! বিয়ে তো সবারই হয়—তার জন্যে দু'টি মুড়ি কে রিফিউজ করে? আমি তো আর চুমু খেতে চাই নি।

রুনু। এই, মেজকাকা এসে পড়লেন বুঝি—

রমেশ। (টেবিল হইতে কতগুলি বই মেঝের উপরে সজোরে ফেলিয়া দিয়া) আসুন না ছাই! এলেই তো হয়—এলেই তো একটা ঘুসি মেরে তাঁর তিন-তিনটে পোকা-দাঁত ভেঙে ফেলতে পারি। ডেনটিস্টের বাড়ি যাওয়ার খরচাটা তাঁর বেঁচে যায় তা হলে। কিন্তু হৃদয় জিনিসটা এমনি মজার, সারা শরীর তন্ন-তন্ন করেও তাকে তুমি খুঁজে পাবে না,

অথচ তার ব্যথাটা দিব্যি টের পাওয়া যায়। আরো মজার হচ্ছে এই, তাকে সাঁড়াশি দিয়ে উপড়ে ফেলেও তার ব্যথার চিকিৎসা চলে না। সত্যি রুনু, তোমাদের ঘরে দু'মুঠো মুড়িও নেই ?

রুনু। (ক্লান্ত স্বরে) তোমাকে খাওয়াতে পারি এমন কী সাধ্য আমাদের !

রমেশ। গৌরবে বহুবচন করে দিয়ে সেরে গেলে। নইলে আমাকে খাওযাবার তোমার যা সাধ্য আছে তা সহজে ফুরোবার মত নয়। কিন্তু তাতে পেট ভরে না—এই যা। আপত্তি করেই বা লাভ কি ? একটু এগিয়ে এস রানি—ভয় নেই, বই পড়ার শব্দ শুনেও যখন তোমার মেজকাকা তাঁর দাঁতের ব্যথা ভুলে আছেন, তখন—ভয় নেই, শব্দ হবে না।

রুনু। তুমি কি পাগল হলে না কি রমেশ-দা ?

রমেশ। মিথ্যা করে মাথা-ধরা ও প্রেমে-পড়ার ভান করা যায়, কিন্তু পাগল সাজা যায় না ; মানুষের ক্ষমতার এ একটা বড় রকমের খুঁত। অভিনয় করলেও আচরণে যথাসময়ে এমন একটা সঙ্গতি এসে যায় যে ধরা পড়তে হয়—লজ্জার একশেষ তা'তে। (হঠাৎ দাঁড়াইয়া—মাথার চুলগুলি আরো উসকোথুসকো করিতে করিতে) আমাকে পাগল-পাগল দেখাচ্ছে, না রুনু ? ঠিক যেন এলিজাবেথান যুগের প্রমত্ত প্রেমিকের মত ! জামার বোতামগুলি পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে। এমনি পোশাকেই নাকি হ্যামলেট ওফিলিয়ার ঘরে ঢুকেছিল,—ওফিলিয়া ভেবেছিল পাগল ! শেক্‌স্‌পীয়ার একটু বোকাটে ধরনের—এত বাধ্য মেয়ে ওফিলিয়া—তুমি যেমন তোমার মেজকাকার ভয়ে তটস্থ, ওফিলিয়াও তেমনি তার বাপের কথায় ওঠে-বসে—সেই ওফিলিয়ার বিয়ে দিলে না ? তাকে সত্যি-সত্যিই পাগল করে ছাড়লে ! বিয়ে হয়ে গেলে শীতাংশুবাবুর কাছ থেকে পড়ে নিয়ো—উনি আবার তোমাকে বোঝাতে পারেন তবেই বাঁচি। কী না তিনি ? রেলের ডাক্তার ?

রুনু। (চটিয়া) আর তুমি কী শুনি? একটা ইনজিনিয়ার,—কলের কুলি। ক' টাকা মাইনে পাও?

রমেশ। তুমি হঠাৎ এত চটে উঠলে যে আর আমার দু'টি মুড়ি পাবারো আশা রইল না। (ব্যাগ খুলিতে-খুলিতে) অগত্যা নিজেরই যা সম্বল আছে তাই বার করা যাক। (ব্যাগ হইতে গোটা পাঁচ-ছয় সিগারেটের টিন বাহির করিয়া পুনরায় চেয়ারে আসিয়া বসিল। একটার উপর আরেকটা টিন উঁচু করিয়া সাজাইয়া রাখিতে-রাখিতে) ঘরে তো পথের জন্যে খাবার তৈরি করে দেবার লোক নেই, তাই সারা পথ খালি ধোঁয়া গিলেছি—তোমাদের অর্থাৎ মেয়েমানুষের প্রেমের মতই ধোঁয়া, সারশূন্য। বসে-বসে তাই একটা ফোঁকা যাক।

রুনু। (বিমর্ষ) এ-বিদ্যাটা কবে থেকে আয়ত্ত করলে? ওটা না হলে বুঝি চলত না? ও কি, ওটা তুমি এই ঘরে বসে আমার সামনেই খাবে নাকি?

রমেশ। (সব চেয়ে উঁচু টিন হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ডান হাতে ধরিয়া বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের উপর ঠুকিতে-ঠুকিতে) জীবনের এত বড একটা আবেগই তোমার কাছে লুকোইনি, এ তো সামান্য একটা সিগারেট। লেডি-র সমুখে ধূমপান করায় আজকাল আর অবিনয়ের অপরাধ নেই, কেননা লেডিরাও—(দেশলাই জ্বালাইয়া সিগারেট ধরাইয়া) কবে থেকে খাই? কাল রাত থেকে—ট্রেনে। একটা কিছু খুব আস্তে-আস্তে পুড়ে যাচ্ছে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছিল। তুমিও একটা খাও না—কর্কটিপ্‌ড্‌ আছে, তোমার ঠোঁটে আটকাবে না।

রুনু। ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল, মেজকাকা এসে পড়লে কী ভাববেন বল তো?

রমেশ। (হাসিয়া) তিনি এলেই তাঁকে একটা সিগারেট অফার করব। তামাকে দাঁতের গোড়া শক্ত করে। তাঁর উপকারই হবে।

কনু। (বেদনাহত স্বরে) আর কী নেশা ধরেছ?

রমেশ। মদ? ও ভারি সাবেকি,—মামুলি। ও, আমি পছন্দ করি না। ভাবছি, তামাক সেজে দেবার জন্যেই বোধহয় আমাকে বিয়ে করতে হবে। আমার বিয়েতে যাবে তো কনু? কেন নয় শুনি? আমার ঘরের পাশের ঘরে তো আর আমার মেজকাকা নেই।

কনু। (বিরক্তির ভান করিয়া) জান, সাত দিন পরে আমার একজামিন—ওঠ, আমাকে পড়তে দাও। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে মেজকাকার সঙ্গে গল্প করগে।

রমেশ। মহম্মদ আসুক পবতের কাছে। এই টিনগুলি তোমার ট্রাঙ্কে রেখে দাও—তোমার অনেক কাজে আসবে; ছুঁচ সুতো বোতাম ঝিনুক রাখতে পারবে। (একটা খাতা দিয়া বাতাস করিতে-করিতে) তোমাকে ভারি সুন্দর লাগছে কনু—পরস্ত্রী হবে বলে বোধহয়। তোমার স্বামীকে চিঠিতে কী বলে সম্বোধন করবে? অভিধান দেখে একটা নতুন কিছু বার কোরো—পুনরুক্তিটা ভাষাজ্ঞানের পরিচয় নয়।

কনু। কে বললে তোমাকে, আমি বিয়ে করছি?

রমেশ। বিয়ে যে তুমি করছ না তা আমি জানি—বিয়ে তোমার হচ্ছে। খবরটা কোথা থেকে পেলাম? তোমার মেজকাকা চিঠিতে ঘটা করে চার পৃষ্ঠা ভরে আমাকে জানিয়েছে। নেমন্তন্নের রাতে ভাঁড়ারের ভারটা যে আমার ওপরই ন্যস্ত করে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন চিঠিতে তারো উল্লেখ আছে।

কনু। মেজকাকা।

রমেশ। কেন জানাবেন না শুনি? আমার অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের খবরটা জানাতে তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল না। ডাক না তাঁকে। তাঁকে একটা সিগারেট খাওয়াই।

কনু। (ধীরে) আমার বিয়েটা তোমার পরাজয়?

রমেশ। (তীক্ষ্ণতার সঙ্গে) তোমার কী মনে হয়? পরাজয়ে তবু একটা আঘাতের সম্মান থাকে, কিন্তু এ-পরাজয় অপমানের কলঙ্ক দিয়ে মাখা!

রুনু। (সহসা) তবে এ বিয়ে আমি ভেঙে দেব, রমেশ-দা।

রমেশ। (আমোদ অনুভব করিয়া) কেন, কেন? মেজকাকার আদেশ না পেয়েই?

রুনু। (দৃঢ়স্বরে) আমার বিয়ে হলে তোমার জীবন যদি ব্যর্থ হয়, সে-বিয়ে আমি তোমার মঙ্গলের জন্যে পরিত্যাগ করব, রমেশ-দা।

রমেশ। (হাসিয়া উঠিয়া) ব্যর্থ, ব্যর্থ—শব্দটার বানান জান তো রুনু? তুমি বিয়ে কর আর না কর, এই সিগারেটের টিনগুলি তুমি নিয়ো—খালি কৌটো—একদিন এর মধ্যে যা কিছু ছিল সব ধোঁয়া হয়ে গেছে—গরিব লোক, তোমার প্রেমের বিনিময়ে এ-ছাড়া কী-ই বা আর দেবার আছে? বিয়ের পর মশলা রাখতে পারবে। ব্যর্থ—আমি ব্যর্থ হব বলে তুমি বিয়ে করবে না? অসীম তোমার দয়া! জীবনে এমন শুভার্থিনী বন্ধুও আমার আছে আগে জানলে—(হঠাৎ স্বর নিচু করিয়া) উঃ, কী রোদ! (সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে কপালের ঘাম মুছিল।)

রুনু। ঠাট্টা নয়,—আমার বিয়েতে তুমি যদি অসুখী হও সে আমি সইতে পারবো না।

রমেশ। বিয়ে না করে তুমি কী করবে?

রুনু। কেন? চিরকুমারী থেকে কি কেউ বড় কাজ করেনি?

রমেশ। মনে তো পড়ে না। তা তুমি চিরকুমারী থাকবে কেন? আমার টাটানগরের কোয়ার্টারে কি তোমার জন্যে আরেকখানা খাট পড়তে পারে না?

রুনু। না।

রমেশ। কেন?

রুনু। তোমাকে আমি দাদার মত ভক্তি করি—

রমেশ। দাঁড়াও রুনু, একটু দাঁড়াও—আস্তে। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নিই—মাথাটা ঠিক খেলছে না। (একটা সিগারেট ধরাইয়া) কী বললে?—দাদার মত! শীতাংশুবাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে গেলে তাঁকে কী রকম ভালবাসবে? মামার মত! দাঁড়াও, নোটবুকে লিখে রাখি (বুক-পকেট হইতে নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া)—জীবনে এ একটা স্মরণীয় ঘটনা। রুনু, তোমার ওরিজিন্যালিটি আছে। (নোটবুক ও পেন্সিল রাখিয়া দিল)

রুনু। (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) কী অমানুষিক যন্ত্রণা পেয়ে আমাকে এই বিয়েতে মত দিতে হয়েছে তা যদি তুমি জানতে, তা হলে আমার সঙ্গে এই নির্মম পরিহাস করতে না। নিজের বেদনাকে বড় করে দেখানোই পুরুষের দুর্বলতা; বিয়ে হয়ে গেলেও তোমাকে ভুলতে পারবো না—এ যে আমার কী শাস্তি, তা তুমি কী বুঝবে?

রমেশ। তোমার লজিক দেখছি একেবারে নির্ভুল, নিখুঁত। আমাকে ভুলতেই যদি পারবে না, তবে এস না আমার সঙ্গে—টাটানগরে; যদি চাও তো তোমাকে সূর্যাস্তের পারে নিয়ে যাবো—যেখানে দিগন্ত বলে কোন দৃষ্টির সীমারেখা নেই। কী বলছ? মেজকাকার মত নেই? কে এই মেজকাকা—কে তার তোয়াক্কা রাখে? (সহসা উঠিয়া রুনুর হাত ধরিয়া) তুমি এস আমার সঙ্গে—বি. এন. আর. বম্বে মেল ধরবার এখনো সময় আছে।

রুনু। (কান্নাজড়িত ভীতস্বরে) হাত ছাড়, রমেশ-দা।

রমেশ। (হাত ছাড়িয়া, খানিকটা পায়চারি করিয়া উত্তেজনা প্রশমিত করিয়া নিল) দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদলে ছবিটার মধ্যে ব্যালেন্স থাকে না রুনু, অতএব চেয়ারটাতে বসে দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে

দাও। চেয়ারে একটা খবরের কাগজ পেতে নিয়ো, নইলে চুপ করে বসে বেশিক্ষণ কাঁদতে পাবে না। কান্না একটা বহুমূল্য মূলধন, ওকে অমনি করে অপব্যয় করতে নেই—ইকনমি শেখ।

রুনু। (চেয়ারে না বসিয়া) আমার মরণ কেন হল না—কেন তোমার এই অকারণ দুঃখের দায়িত্ব আমাকে নিতে হল? একটা সামান্য মেয়ের জন্যে তোমার এই অস্থিরতা শোভা পায় না—তুমি পুরুষ, সামনে তোমার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ—বিস্তীর্ণ বিস্মৃতি। কে কবে একটা মেয়ে তোমার জীবনে রঙিন প্রজাপতির মত উড়ে এসেছিল, তাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ কি তোমাকে মানায়? তুমি কর্মী, তুমি—

রমেশ। (জোরের সঙ্গে) বক্তৃতা রাখ, রুনু। ও-সব বক্তৃতা রাত্রে মশারির নিচে শুনতে হয়—আমাকে নয়, যথাস্থানে নিবেদন করলে আশাতিরিক্ত তারিফ পাবে। (চেয়ারে বসিয়া) হ্যাঁ, মরণ সম্বন্ধে কী যেন বলছিলে?

রুনু। (কাতরস্বরে) মৃত্যুকে আহ্বান করলেই সে আসে না।

রমেশ। ঘাড় ফিরিয়ে থাকে বুঝি? ভারি বে-আক্কেল তো! কিন্তু কাঠুরের গল্পটা মনে আছে তো, রুনু? মৃত্যুকে দেখতে পেয়ে শেষকালে কাঠের বোঝা ফেলে ছুটবে না তো?

রুনু। (উদাস স্বরে) প্রার্থনা কোরো রমেশ-দা, যেন সতেরোই বোশেখের আগে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারি—আর সইতে পারি না।

রমেশ। (হিসাব করিয়া) আজকে তেরো-ই চৈত্র, না, না—চোদ্দই; আমার বাঙলা তারিখ মনে থাকে না। তা, তোমার বেশ আবদার তো, রুনু। মরবার জন্যে তুমি হাতে প্রায় পুরো একটি মাস রাখতে চাইছ—তোমার ওরিজিন্যালিটি আছে। (হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে একটা কাগজের পুটলি বাহির করিয়া) আমার প্রার্থনা-

ট্রার্থনা কোনো কালেই আসে না—ও আমি পারি-ও না। এই নাও, এই বাণ্ডিলে আধ সের আফিং আছে, চৌবাচ্চা থেকে এক ঘটি জল নিয়ে এস গে—গিলে ফেল। আমি খাটে বিছানা পেতে রাখছি—তোমাকে সতেরোই বোশেখ পর্যন্ত কষ্ট করে অপেক্ষা করতে হবে না—আধ ঘণ্টাতেই সাবাড়! ততক্ষণে বম্বে মেল ছেড়ে গেছে।

কন্নু। (ভীত হইযা) আফিং? আধ সের?

রমেশ। হ্যাঁ, মরবার আগে তোমাকে একটা চিঠিও লিখে রেখে যেতে হবে। সেটা ভারি ফ্যাশানেবল হবে। দাঁড়াও, কী লিখবে, ভাবছি। "প্রেমের জন্য আত্মাহুতি।" খুব সংযত বাক্য, কী বল, কন্নু? চুপ করে দাঁড়িযে রইলে যে।

কন্নু। (চমকিত অবস্থায) তুমি পকেটে করে আধ সের আফিং নিযে বেড়াচ্ছ?

রমেশ। হাঁসের ডিম খেতে চাইলাম, দিলে না তো? অগত্যা এই আমার আহার্য।

কন্নু। তুমি ভাব কী রমেশ-দা। তুমি আত্মহত্যার ভয় দেখিযে আমাকে বিয়ে করতে চাও?

রমেশ। ছিঃ। এই একটু আগেই বলছিলে না—তুমি সামান্য মেযে। সে-কথা আমি ভুলি নি। তোমার জন্যে আত্মহত্যা করে তোমাকে একটি অবিনশ্বর মর্যাদা দিতে যদি কৃপণতাই করি কন্নু, তো ক্ষমা কোরো—আমি মরে তোমার খোসামোদ করতে চাই না। তবে, তুমিই খানিক আগে সখ করে মরতে চেয়েছিলে বলে মহৌষধিটা বার করেছিলাম। বেশ, গল্পের কাঠুরের মত যদি তোমার মৃত্যুর ভয়ে সম্প্রতি হার্টফেল হবার উপক্রম হয়ে থাকে—আমিও কথা পালটে নিচ্ছি। মরে তোমার কাজ নেই—বরং আর-একটু চোখের জল ফেল; দেখি।

রুনু। (উত্তেজিত হইয়া) বিধাতার কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করেছি বলে আমাকে ভীরু কাপুরুষের মত আত্মহত্যা করতে হবে নাকি?

রমেশ। মৃত্যুর আশীর্বাদ সকলের কাছে এক চেহারা নিয়েই দেখা দেয় না। যে চলন্ত ইঞ্জিনের তলায় বুক রেখে মরে, সেও বিধাতার ইচ্ছার অনুবর্তী হয়েই মরে। তোমার কাছে মৃত্যুও আজ এমনি নিদারুণ নিষ্ঠুর মূর্তি নিয়ে এসেছিল—তুমি ভীরু, একান্ত দুর্বল বলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করলে। তোমার ছেলে হলে তার কাছে এই ঘটনাটাকে রূপকথায় রূপান্তরিত করে তোমার সাহস সপ্রমাণ কোরো—এখন নয়।

রুনু। (উত্তেজিত অবস্থায়) তুমি ভয় দেখিয়ে আমাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করছ—দাঁড়াও, আমি মেজকাকাকে ডেকে আনছি।

রমেশ। (সহসা উত্তেজিত হইয়া দরজায় কাজে গিয়া রুনুকে বাধা দিল। সহসা অন্য পকেট হইতে একটা রিভল্‌ভার বাহির করিয়া) কিন্তু যদি অন্যে কেউ তোমাকে হত্যা করে—(স্টেজ এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ) চেঁচিয়ে লাভ নেই রুনু,—কণ্ঠনালীর মধ্যে তোমার উদ্গত চিৎকার অর্ধপথে থেমে যাবে। মরতে হয় তো নিজে মরবে, চেঁচিয়ে মেজকাকার দাঁতের ব্যথা বাড়িয়ে তাঁরো মৃত্যুর কারণ হলে তোমার সাহসের গৌরব এক তিলও বাড়বে না। অত কাঁপছ কেন?

রুনু। (অতি কষ্টে) তুমি আমাকে খুন করবে, রমেশ-দা?

রমেশ। (সহজ ভাবে) খুব সহজেই করতে পারি—যে কাউকে; প্রেমে-পড়ার চেয়েও ও সোজা। তবে কাউকে খুন করার আগে তর্ক করে খুন-করার উপকারিতা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে নিতে চাই। চেয়ারে বোস গে—তর্ক করা যাবে। (রুনু ধীরে-ধীরে আসিয়া চেয়ারে বসিল)

রুনু। (সহজ হইতে চেষ্টা করিয়া) খুন করা সম্বন্ধে এত সব নিয়ম-কানুনও বার করে ফেলেছ দেখছি। ডাকাতি কদ্দিন থেকে করছ?

রমেশ। জানি না—হয়তো বহুদিন থেকে। আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না রুনু, তোমার নিশ্চিন্ত হবার কোনোই কারণ নেই। অরক্ষিত অবস্থায় কাউকে হত্যা করার মধ্যে আমি বিলাস দেখি না, সেটার মধ্যে সভ্যতাও নেই। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমার জীবনে তোমার মৃত্যুর পরম প্রয়োজন হয়েছে। তা ছাড়া, তুমিও মরণের জন্যে এক মাসের ব্রত নিয়েছ—

রুনু। (আবার ভয় পাইয়া) সত্যি, ছেলেমানসি কোরো না, রমেশ-দা। বিয়ে না হয় আমি ভেঙে দিচ্ছি।

রমেশ। (হাসিয়া) টাটানগর থেকে টোটা ছুড়লে তা এত দূর আসবে না—অতএব এ-গুলি ফসকালে বিয়ে তোমার অটুটই থাকবে। টাটানগরে ফিরে যাবার আগেই এই কাজটা আমি শেষ করে দিতে চাই। মরতে চেয়ে এখন পেছুলে চলবে না—ভণ্ডামিরও একটা সীমা থাকা উচিত। আর যার সঙ্গে চলুক, মৃত্যুর সঙ্গে ফ্লার্ট চলে না। বেশ—তর্ক করে বোঝাবার সময়টুকু না হয় রিভলভারটা পকেটেই রাখলাম। (রিভলভারটা পকেটে রাখিল) ভয় পেলে তোমার মুখখানাকে ঠিক বাঙলা পাঁচ-এর মত দেখতে হয়,—আমার হাসি পায়—ঘটনার গাম্ভীর্যটা হালকা হয়ে ওঠে। মুখের ভাব স্বাভাবিক কর, রুনু।

রুনু। (স্বাভাবিক হইবার চেষ্টায় ফিকা একটু হাসিয়া) একটা ফাঁকা রিভলভার দেখিয়ে খুব বীরত্বের পরিচয় দিলে যা হোক।

রমেশ। ও। এখন রিভলভারটা পকেটে ঢুকেছে কি না, তাই সেটা ফাঁকা হয়ে গেল! এখন বুঝি ফের ভাঙা বিয়ে জোড়া দিতে সাধ হচ্ছে, রুনু! তুমি একেবারে প্রাগ্‌বিজ্ঞানযুগের লোক—তক্ করে হত্যা করার আর্ট বোঝবার মত বুদ্ধি বিধাতা তোমাকে দেন নি। বেশ, চুপ করে বসে থাক, (পকেট হইতে পুনরায় রিভলভার তুলিয়া) ব্লাউজের বোতামগুলি সব খুলে দাও, (তাক করিয়া) ঠিক বুকের মধ্যখানটিতে গিয়ে গুলি

লাগবে। ন'ড়ো না, চেঁচিয়েও ফল পাবে না। (একটু থামিয়া হাত নামাইয়া) তারপর তাজা টাটকা রক্তে মেঝেটা ভেসে যাবে—প্রভাতের আকাশে অরুণ প্লাবনের মত! তুমি সে দৃশ্য দেখতে পাবে না, রুনু—সেইটেই ভারি কষ্টের। (একটু থামিয়া লক্ষ্য ঠিক করিয়া লইল)

রুনু। (তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া, একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল) সারাদিন না খেয়ে না নেয়ে এই কাঠফাটা রোদ্দুরে মাথা তোমার ঘুলিয়ে উঠেছে। দাঁড়াও, কলে হয় তো এতক্ষণে জল এসে গেছে—আমি কাপড় এনে দিচ্ছি, স্নান করে এস গে। আমি উনুন ধরিয়ে চাল-ডাল চড়িয়ে দিচ্ছি ততক্ষণ! তুমি মাথায় কী তেল দেবে? সাবান লাগবে? দিশি?

রমেশ। বাঃ, বাঃ, রুনু, সহসা যে দয়ায় বিদ্যাসাগর বনে গেলে। (রুনুকে যাইতে বাধা দিয়া) জানি, তুমি এই সুযোগে মেজকাকাকে ঘুম থেকে তুলে আনবে। তার কোনো দরকার নেই। এই নাও রিভলভার, এবার এটা নিয়ে তুমি খানিকক্ষণ খেলা কর—ইচ্ছা হলে আমাকে লক্ষ্য করে গুলিও ছুঁড়তে পার। ব্যাপারটা একটুও কঠিন নয়, একটু দেখিয়ে দিলেই পারবে। (রুনুর খুব কাছে আসিয়া) এই নাও, ধর—এমনি করে ধরতে হয়; বুড়ো আঙুলটা এমনি রেখে তর্জনীটা পিন-এর গায়ে দিয়ে—এই, বুঝলে তো? ইচ্ছা করলে এবার আমাকে—

পাশের ঘর হইতে মেজকাকার কাশির ঘন-ঘন আওয়াজ শোনা গেল—মেজকাকার ঘুম ভাঙিয়াছে। চটি জুতার শব্দ ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—মেজকাকা রুনুর ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

মেজকাকার বয়স পঁয়তাল্লিশ হইবে। মাথা, গাল ও গলার সঙ্গে একত্র করিয়া কম্ফার্টার বাঁধা—চোখে চশমা আছে। পরনে জিন-এর কোট, তার উপর কোমরে কাপড়ের বাঁধ দেওয়া।

মেজকাকার পায়ের শব্দ পাইয়াই রমেশ তাড়াতাড়ি রিভলভারটা পকেটে পুরিয়া চেয়ারটা টেবিলের কাছে টানিয়া লইল ও বাঁ হাতে রুনুর একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পাশে

টেবিলের ধারে দাঁড় করাইয়া দিল। টেবিলের উপর বন্নুর লজিক এর বই খানি খোলা ছিল, তাহারই উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রমেশ বন্নুকে যেন গভীর তন্ময়তার সঙ্গে লজিক বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

রমেশ। (শিক্ষকের মুরুব্বিয়ানার সুরে) তোমার কিছুই তৈরি হয়নি লজিক—এ-রকম হলে কী করে যে পাশ করবে তাই ভাবি—পাশ না করলে বরও পশ্চাৎ-প্রদর্শন করবেন। সামান্য 'আনডিস্ট্রিবিউটেড মিডল' বোঝাতেই এক ঘণ্টা লাগালে—বিধাতা কি তোমার মস্তিষ্কে শুধু গোবর দিয়েছিলেন? হাঁ করে চেয়ে আছ কি ওদিকে? টেবিলের এই ধারটাতেই বোস না।

মেজকাকা। (একটু কাছে আগাইয়া) বেথুন কলেজে কবে থেকে লজিকের মাস্টারি করছ হে ছোকরা?

রমেশ। (সন্ত্রস্ত হইবার ভান করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া) ও! আপনি? বসুন। এ-রকম ভালুক সেজে কোত্থেকে এলেন? কথার উচ্চারণ এত ভারি-ভারি ঠেকছে কেন? লজেনচুষ খাচ্ছেন না কি?

মেজকাকা। (দারুণ চটিয়া) তার মানে?

রমেশ। তার মানে, বেথুন কলেজের মাস্টারি আমি পাইনি—একটি ছাত্রী জোগাড় করেছি শুধু। তবে, শুনেছি, মেয়ে-কলেজে মাস্টারি করতে হলে বাড়িতে একটি বোস্টমি দরকার। তারই সুবিধা খুঁজতে আপনার বাড়িতে আজ আমি অতিথি।

মেজকাকা। তোমাকে বলেছি না আমার বাড়িতে কোনো দিন আর ঢুকতে পাবে না—

রমেশ। মানুষের মত বাড়িরও একটা অস্তিত্ব আছে মেজকাকা—আপনাকে না হয় আজ আমিও মেজকাকা বলেই ডাকছি—আপনার বাড়ি-ই আপনার ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

মেজকাকা। এ বাড়িতে তোমার নষ্টামি চলবে না,—তোমার যদি

আত্মসম্মান বলে কোনো পদার্থ থাকে—তা হলে যাও আমার বাড়ি ছেড়ে। (রুনুর প্রতি) এই অভদ্র স্কাউনড্রেলটা কতক্ষণ বাড়িতে ঢুকেছে—আমাকে জাগাস নি যে? (রুনু নীরব)

রমেশ। আপনি যে দাঁতের ব্যথায় দাত খিঁচিয়ে পড়ে ছিলেন তখন। আহা, কম্ফার্টারে আপনাকে কী যে মানিয়েছে মেজকাকা—(হাসি)

মেজকাকা। (কিছু কাল স্তম্ভিত থাকিয়া) তুমি যাবে কি না বল—র‍্যাস্কেল, স্টুপিড—

(রুনু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

রমেশ। এখন থেকেই কাপড়-চোপড় গুছোতে শুরু কর—কোথাও যেতে হলে তোমাদের তো আবার ঘণ্টা পাঁচেক আগে নোটিশ দিতে হয়। বেশি কিছু নেবার দরকার নেই—খানকয়েক শাড়ি ব্লাউজ আর পেটিকোট। দরকারি জিনিস পরে কিনে নিলেই চলবে—সঙ্গে আমার টাকা আছে। শোনো, তোমায় জন্মদিনে সেইবার যে একটা টর্চ দিয়েছিলাম, সেটাও সঙ্গে নিয়ো। রাত্রিকালে কাশীর গলিতে টর্চ না হলে ভারি অসুবিধে হয়।

মেজকাকা। (ভ্যাবচাকা হইয়া) তার মানে? কোথায় যাচ্ছিস, রুনু?

রুনু। কোথাও না তো!

রমেশ। কোথাও না মানে? এইমাত্র না আমাদের ঠিক হল—আমি তোমাকে এলোপ করে প্রথম কাশী নিয়ে যাব—সেখান থেকে ডিরেক্ট বৃন্দাবন! বেশ তো, মেজকাকা জেনেই গেলেন না হয়—হ্যাঁ, আমিও ও সব লুকোচুরি পছন্দ করি না। আঃ, যমুনার পারে বালির ওপর জ্যোৎস্না রাতে আমাদের কী সুখেই যে কাটবে মেজকাকা, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। যাও—মেজকাকার দেওয়া কোনো জিনিসই নিতে পারবে না—আমি এখুনি গিয়ে ওয়ান্-আপ্-এ দু'খানা বার্থ রিজার্ভ করে আসছি—একটা 'কুপে' পেলে তো কথাই নেই।

মেজকাকা। (রুনুর প্রতি তীক্ষ্ণস্বরে) এ সব সত্যি?

রমেশ। সত্য কথা বলতে ভয় পেয়ো না, রুনু। কিসের ভয় মেজকাকাকে? নদীস্রোত কি মাটির ঢিবিকে ভয় করে? বল সোজা হয়ে—যে আমার প্রেমিক, যে আমার হৃদয়ের অধীশ্বর, যার স্পর্শে মথিত সমুদ্রে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি—তার পথই আমার পথ, তার কলঙ্কই আমার ললাট-তিলক। ভয় পেয়ো না রুনু, আমার পকেটে কী আছে তা মনে করে অন্তত সত্য কথা বল।

রুনু। সব—সব মিথ্যে, মেজকাকা।

(রুনুর প্রস্থান)

রমেশ। ভীরু, ভীরু! কিসের জন্য ওদের লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন, মেজকাকা? সোজা সত্য কথা পর্যন্ত বলতে সাহস পায় না।

মেজকাকা। তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে যাবে কি না বল—

রমেশ। আপনার যদি সাধ হয় আপনি পাশের ঘরে বসে আরো কতক্ষণ গড়ান গে—রুনুর সঙ্গে আমার একটা জরুরি পরামর্শ আছে। কাশী-টা ওর পছন্দ হয় নি মনে হচ্ছে—বেশ, মুসৌরি যাওয়া যাবে। জায়গাটা সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে আপনার? সী লেভেল থেকে ক' ফিট উঁচু? সেখানে পাহাড়ের উপর ছোট একটি বাড়ি—আমি আর রুনু, রুনু আর আমি। তখন কোথায় বা মেজকাকা, কোথায় বা তাঁর কম্ফার্টার!

মেজকাকা। আমার বন্ধুর ছেলে, তা হ'লেই বা—তোমার নামে আমি কেস করব।

রমেশ। (টিন হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া ধরাইতে-ধরাইতে) বেশ, করবেন—তার জন্যে এত ব্যস্ত কি? আমি আর রুনু মুসৌরি চলে গেলে ও মামলা রুজু হতে পারবে। (আরেকটা সিগারেট লইয়া মেজকাকার দিকে প্রসারিত করিয়া) একটা

খাবেন ? ইজিপ্‌শিয়ান্‌ ব্লেনড, রথম্যান কোম্পানির। মদ খেয়ে খেতে হয় শুনেছি, কিন্তু আমার সাদা মুখেই ভাল লাগে। নিন একটা—

মেজকাকা। ছোটলোক কোথাকার! তোমার সামান্য ভদ্রতাজ্ঞান নেই! যদি তোমার আত্মসম্মান বলে কিছু থাকে তবে ভালয়-ভালয় পালাও, বলছি ; নইলে চাকরের হাতে তোমাকে লাঞ্ছিত হতে হবে।

রমেশ। আপনাকে তো আগেই বলেছি আমি আত্মসম্মানের নির্বিষ ফণা বিস্তার করতে জানি না। তার চেয়ে আমার কাছে আরেকটা জিনিস আছে, তাই আপনাকে দেখাই। (পকেট হাতড়াইয়া রিভলভারটা বাহির করিয়া) আপনার বাড়িতে ক'টা চাকর আছে ?

মেজকাকা। (চেঁচাইয়া) এ্যাঁ—এ্যাঁ ! পুলিশ ! পুলিশ !

রমেশ। পুলিশ আপনার সম্বন্ধী নয় যে আপনার চিৎকার শুনে তার ভগ্নীর বৈধব্য আশঙ্কা করে আপনাকে সাহায্য করতে আসবে। বেশ, বেশ—অমনি হাঁ করে থাকুন—শুনেছিলাম আপনার দাঁতে ব্যথা, একটা গুলি মেরে অন্তত আপনার দাঁতগুলি উড়িয়ে দিই। (রিভলভারের মুখটা মেজকাকার মুখে ঢুকাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল।)

মেজকাকা। (পিছাইয়া গিয়া) তুমি আমাকে দিনে-দুপুরে খুন করবে রমেশবাবু ?

রমেশ। বাঃ, আমি যে আজ হঠাৎ বাবু হয়ে গেলাম। আপনার আপত্তিটা কিসে শুনি ? খুন-করায় আপত্তি, না, দিনে-দুপুরে খুন-করায় ? বুঝিয়ে দিন। বসুন চেয়ারটায়—বসুন। (মেজকাকা চেয়ারে আসিয়া বসিল।)

মেজকাকা। এমনি অকারণে একটা মানুষের অমূল্য জীবন তুমি নেবে, রমেশ ?

রমেশ। সব কাজেরই একটা কারণ দেখাতে গেলে বিধাতাকেও ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়। হাতে একটা রিভলভার এসেছে—আপনার

দাঁত বত্রিশটা উড়িয়ে দিয়ে ওটার সদ্ব্যবহার করতাম। আপনার জীবন অমূল্য না হাতি! ডাকুন না আপনার চাকরগুলোকে—

মেজকাকা। তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টা করছিলাম, রমেশ। চাকররা এই সময়ে কেউ বাড়িতে থাকে নাকি?

রমেশ। (উৎফুল্ল হইয়া) চাকররা কেউ বাড়ি নেই? তা হলে তো আরো সুবিধে—আমাকে কেউই বাধা দিতে পারবে না। হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত—হাঁ করুন; কেন শুধু-শুধু দাঁতের জন্যে যন্ত্রণা ভোগ করছেন? (রিভলভারটা বাগাইয়া ধরিল।)

মেজকাকা। (ভয়ে মুখ পাংশুবর্ণ, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে) মানুষের জীবনের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা নেই? তুমি উচ্চবংশের ছেলে, উচ্চশিক্ষিত,—তুমি কি এত নিষ্ঠুর হতে পার? তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি বটে, কিন্তু তোমার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাই, রমেশবাবু।

রমেশ। (একটু নাটুকে ঢঙে) ক্ষমা নেই, মেজকাকা! মানুষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার কথা বলছিলেন না? গত মহাযুদ্ধ মানুষের সেই মোহ ভেঙে দিয়েছে। দেশে-দেশে মড়ক—পৃথিবীব্যাপী মৃত্যুর ঘূর্ণি চলেছে—তাতে আপনিও উড়ুন! হ্যাঁ, হাঁ করুন—আমার এক সেকেণ্ড-ও লাগবে না; পাড়া বেড়িয়ে আপনার স্ত্রীর বাড়ি ফেরবার আগেই কাজটা শেষ করে দিতে চাই।

মেজকাকা। (কাকুতি করিয়া) তোমার কাছে জীবন-ভিক্ষা চাই, রমেশবাবু।

রমেশ। (ধমক দিয়া) আবার বাবু!

মেজকাকা। আমাকে মেরে তোমার কোনো লাভ নেই—আমাকে ছেড়ে দাও।

রমেশ। লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখবার সময় আমার নেই—আমার হাতটা নিসপিস করছে। নিচে বাসন মাজবার শব্দ হচ্ছে—

আপনাব চাকর এসেছে বুঝি? উনুনে আগুন-ও দেওযা হচ্ছে—কী তার নাম? ডাকুন না তাকে।

মেজকাকা। তোমার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি—

বমেশ। কী অপবাধ কবেন? এই গবমে গালের ওপর একটা ধুসো কম্ফার্টার চাপিযেছেন কেন? খুলুন, খুলে ফেলুন ওটা—তুপুববেলা একটা বন-বেড়ালেব মত চেহারা করে বসে আছেন। খুলুন। (মেজকাকা কম্ফার্টাব খুলিযা ফেলিতে লাগিলেন। রমেশের হাসি।) বাঃ, বাঁ গালটি তো দিব্যি ফুলেছে—যেন একটি বাতাবি-লেবু। বেশ, ঐ গালটাকেই বোমবার্ড করা যাক। (বিভলভারটা আবাব বাগাইল।)

মেজকাকা। শোন বমেশ, আমাকে না হয অসহায নিরস্ত্র পেযে তুমি খুন করলে। সেটা তোমার দুঃসাহসের পরিচয হতে পারে, কিন্তু সেটা তোমার বীরত্ব বা মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত হযে থাকবে না। এবং তার পরিণাম কী ভীষণ হবে ভেবে দেখেছ?

রমেশ। (যেন কিছু না বুঝিযা) কী হবে পরিণাম?

মেজকাকা। তুমি ধরা পড়বে, ফাঁসি যাবে।

বমেশ। (সবাসরিভাবে) যাব। আমার বিরুদ্ধে সে মোকদ্দমা তো আর আপনি আনতে পাববেন না—আপনার সে-গব তো গেল। আর, আপনাকে খুন করলেই যে আমাকে ফাঁসি যেতে হবে—তা না-ও হতে পারে। মোকদ্দমার ঘোরপ্যাচ বিস্তর—এক ফাঁকে সরেও পড়তে পারি। তা ছাড়া, কে—কে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে শুনি?

মেজকাকা। সাক্ষী কেউ না থাকলেও বিধাতার রাজ্যে কোনো খুনীই পাব পায না, রমেশ। পার পেলেও জীবনে শান্তি পাবে না কোনো দিন।

রমেশ। আর, এখনই যেন শান্তিতে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে। এখানকার বিচারে অন্তত মিথ্যা সাক্ষী-ও কাজে লাগে।

মেজকাকা। কেন, রুনু বাড়িতে আছে, রুনু সাক্ষী দেবে।

রমেশ। (হাসিয়া) রুনু, রুনু সাক্ষী দেবে! রুনু তখন কোথায়? আপনার আদেশ পালন করতে তখন সে-ও তো স্বর্গে গেছে! সে কোথায়? সে নেই।

মেজকাকা। (চমকিত হইয়া) তুমি তাকেও খুন করবে নাকি—রুনুকে?

রমেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, রুনুকে। আপনাকেও।

মেজকাকা। রুনুকে তুমি খুন করবে—সেই রুনুকে—যাকে তুমি এত ভালবাসতে, যার জন্যে তুমি—

রমেশ। বলে যান—যার জন্যে আমি আপনাদের বাড়ির পাঁচিল টপকেছি, কবিতায় মিল দিতে চেয়েছি, দু'-দু'বার বি-এ পরীক্ষায় ফেল করেছি।—হ্যাঁ, বলে যান—

মেজকাকা। তুমি সেই রুনুকে খুন করবে—আমি এ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। সে-ও তোমাকে কত ভালবাসত—

রমেশ। (হাসিয়া) ভালবাসত! হ্যাঁ, সেই রুনুকে! নিজের কথাও দয়া করে মনে রাখবেন। রুনুকে খুন করতে পারি—এ আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? ডাকুন তাকে।

মেজকাকা। আমি তোমার সেই রুনুর-ই মেজকাকা, রমেশ। শুনেছি যাকে ভালবাসা যায় তার আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই নাকি ভাল লাগে—

রমেশ। ভাল লাগে, খালি কাকাদের ছাড়া। (গম্ভীর হইয়া) আমি রিভলভার নিয়ে ছেলেখেলা করতে আসিনি. আমার ঢের কাজ আছে। ডাকুন আপনার ভাইঝিটিকে, আপনারা পাশাপাশি দাঁড়ান, দু'টো গুলি ছুঁড়ে, দু'টো আর্তনাদ শুনে—একটা সিগরেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়ি! (কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রিভলভারটা নিয়া আস্তে

আস্তে বার কয়েক লুফিল।) ডাকুন না। আচ্ছা, আমিই ডাকছি। কনু! কনু!

(কনুর প্রবেশ)

মেজকাকা। (চেয়ার ছাড়িয়া শশব্যস্তে) এখানে আসিস নি, কনু, সরে দাঁড়া। কোথায় ছিলি এতক্ষণ তুই? তোর কাকিমা এখনো বাড়ি ফেরেনি? তার সঙ্গে দেখা হবে না? বাড়ি এসে সে আমার মরা মুখ দেখবে? উঃ, কনু, তুই এমনি বোকা, এতক্ষণে তুই পাড়ার পাঁচজন লোক ডেকে আনতে পারলি না,—কী হবে—

রমেশ। কী হবে এখুনি দেখবেন, ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। কাছে এসে দাঁড়াও, কনু।

কনু। (তিরস্কারের সুরে) তুমি বুঝি আবার মেজকাকাকে ভয় দেখাচ্ছ?

মেজকাকা। (চেয়ারে ফের বসিয়া—কান্নার সুরে) তোদের যদি ইচ্ছা হয় বিয়ে কর তোরা, আমি শীতাংশুর সম্বন্ধ ভেঙে দিই—বোশেখ মাসের প্রথম লগ্নেই হয়ে যাক। আমি দাদাকে আজই লিখে দিচ্ছি, রমেশ-গুণ্ডা তোমার মেয়ের পাণিগ্রহণ করেছে—তোদের বিয়েতে দিন-ক্ষণ পাঁজিপুথির-ই বা কি দরকার? শুধু, আমাকে ছেড়ে দাও বাবাজীবন—আমার স্ত্রী পাড়ায় তার মহিলা-সমিতি থেকে এখনো ফেরেন নি আমার বালিশের নিচে তাঁর জরদার কৌটো ফেলে গেছেন বলে তাঁর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়—ছেলেপুলেগুলো ইস্কুল থেকে এসে জলখাবারের জন্যে এখুনি মেঝেতে গড়িয়ে পড়বে। কে এই সব দেখে বল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরো না ভাই।

রমেশ। (দৃঢ়স্বরে) ও-সব মেয়েলি কাকুতিতে নাদিরশা বা নেপোলিয়ান-এর মন গলতে পারে, আমি তার বহু ঊর্ধ্বে। আপনি প্রস্তুত হ'ন; প্রস্তুত হও, কনু (রিভলভারটা তাক করিয়া) ওয়ান, টু—

(মেজকাকা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন,—রুনুর চোখে কৌতূহল—হঠাৎ থামিয়া গিয়া, রুনুর প্রতি, সুর বদলাইয়া) উনুনে আগুন দিয়েছ, রুনু? কলে জল এসে গেছে? একজামিন দিচ্ছ, ঘরে একটা ঘড়ি রাখনি? ক'টা বাজল এখন?

রুনু। (মুচকি হাসিয়া) চারটে বেজে গেছে।

রমেশ। তোমার রান্নার কত দেরি? আমার তো জিরোবার সময় নেই—এখুনি গিয়ে ফের ট্রেন ধরতে হবে।

রুনু। তা কি হয়? সমস্ত দিন নাওয়া-খাওয়া হয়নি, —কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে কি অতিথি ফিরে যেতে আছে?

রমেশ। মেজকাকা, শুনুন। ও মেজকাকা! (মেজকাকা তেমনই চক্ষু বুজিয়া পাংশুমুখে 'খি' শুনিবার প্রত্যাশায় যেন তন্ময় হইয়া আছেন, সাড়া দিলেন না।) মেজকাকা! শুনছেন? আপনার ভাইঝিটির আতিথ্য এখন উথলে উঠছে! (একটু উদাস স্বরে) সেই রুনু, 'যাকে আমি এত ভালবাসতাম, যার জন্যে আমি—' (মেজকাকার কাঁধে ধাক্কা দিয়া) শুনছেন মেজকাকা?

মেজকাকা। এ্যা, এ্যা—আমি এখনো বেচে আছি? রুনু! তোর কাকিমা ফিরেছে? (কাশিয়া) রমেশ, তোমার রিভলভার?

রমেশ। এই পকেটে পুরছি। (রিভলভার পকেটে পুরিল) সম্প্রতি মনে হচ্ছে মেজকাকা, রক্তের পিপাসার চেয়ে পেটের খিদেটাই আমার প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। এ-সব মেয়েদের কেন যে পয়সা খরচ করে লেখা-পড়া শেখান, বুঝে উঠতে পারি না। সেই কখন এসেছি—না নাওয়া, না খাওয়া—ত আপনার শিক্ষিতা ভাইঝিটির তাতে হুঁস-ও নেই। দু'টো মুড়ি চেয়েও পেলাম না। অথচ এ সেই রুনু 'যাকে আমি এত ভালবাসতাম, যার জন্যে আমি—'

মেজকাকা। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া) নিশ্চয়, নিশ্চয়—এ তোর কী

অন্যায় বল তো। ছি-ছি। দূর দেশ থেকে একজন অতিথি এসেছে—তা আবার আমাদের রমেশ, কতকালের চেনা—তাকে না দিলি দু' মুঠো রেঁধে, না দিলি এক পেয়ালা চা। বুঝলে রমেশ, আজকাল ছেলেমেয়েরা এডুকেশনই পাচ্ছে না।

রমেশ। (ঘাড় হেলাইয়া) যা বলেছেন। ভাত ফুটিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, দু'টো মুড়িও পেটে গেল না। একটু জল-ও পেলাম না স্নান করতে।

মেজকাকা। (কনুর প্রতি তিরস্কারের সুরে) আমাকে কেন ঘুম থেকে তুলে দিসনি? চৌবাচ্চায় জল যদি না-ই ছিল, আমি বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বালতি করে জল এনে দিতাম। লেখা-পড়া শিখতে গিয়ে কি ভদ্রতাকেও জলাঞ্জলি দিতে হয় নাকি? বলি, এখন কলে জল এসেছে তো?

কনু। (নম্র স্বরে) এসেছে।

মেজকাকা। কলে জল এসেছে, রমেশ স্নান করে নাও। রমেশকে সাবান তেল এনে দে, কনু। একটুও যদি বুদ্ধি থাকে। বয়সই বাড়ে, বুঝলে রমেশ, ধাড়-ই হয় শুধু। ছিঃ।

কনু অন্য ঘর হইতে তোয়ালে সাবান তেল ইত্যাদি আনিয়া রমেশের কাছে টেবিলের উপর রাখিল।

রমেশ। (টিন হইতে সিগারেট তুলিয়া) একটা খাবেন নাকি, মেজকাকা?

মেজকাকা। (বিরক্তি চাপিয়া) সিগারেট আমি কোনদিন খাই না, তবে যখন তুমি দিচ্ছ ফেলি কি করে? (রমেশের হাত হইতে একটা সিগারেট লইলেন। কনু বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল।)

রমেশ। (দেশলাই জ্বালিয়া নিজের সিগারেটটা ধরাইয়া, মেজকাকারটাও ধরাইয়া দিল। ধোঁয়া গলায় যাইতেই মেজকাকা বার কয়েক কাশিলেন—রমেশ একটু হাসিল। চেয়ারে বসিয়া পা দুইটা ছড়াইয়া দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে) আপনাদের চাকরটা এসেছে?

মেজকাকা। এসেছে রে, কনু?

কনু। না।

মেজকাকা। চাকর কেন, রমেশ? আমাকেই বল না,—আমি করে দিচ্ছি।

রমেশ। (পা দুইটা আরো একটু ছড়াইয়া দিয়া) চাকরটা এলে ওকে দিয়ে পা-দুটো টিপিয়ে নিতাম—সেই সকাল থেকে হেঁটে-হেঁটে ব্যথা হ'য়ে গেছে—

মেজকাকা। (দারুণ বিরক্তির ভাব মুখে চাপিয়া রাখিলেন) ও এখুনি এসে পড়বে—তুমি ততক্ষণ সিগারেটটা শেষ কর। (কনুর প্রতি) উনুন ধরেছে? ভাত চাপিয়েছিস?

কনু। হ্যাঁ।

মেজকাকা। আর কি কি রাঁধবি?

কনু। রমেশ-দা ডিম খেতে ভালবাসেন। (রমেশের হাসি)

মেজকাকা। আমি যাচ্ছি বাজারে—সব নিয়ে আসছি। তুমি ইতিমধ্যে স্নান করে নাও, রমেশ। এই সময়টায় আমাদের পাড়ার ময়রার দোকানে টাটকা হিঙের কচুরি ভাজা হয়—তাই এক ঠোঙা নিয়ে আসি গে। তুমি বরং এখন চা আর কচুরি ইত্যাদি জলযোগ কর, পরে ভাত হবে 'খন। আমি ফিরতি-পথে মহিলা-সমিতি থেকে কনুর কাকিমাকে নিয়ে আসব—মাছের মুড়োর ঘণ্ট সে খুব ভাল রাঁধে। তুমি খেয়ে-দেয়ে আর কোথাও যেয়ো না—দিন কয়েক আমার বাড়িতেই জিরিয়ে নাও। (কনুর প্রতি) চাকরটা এলে ওকে আর অন্য কাজে লাগাসনি, কনু। রমেশের হাত-পা টিপে দেবে। (রমেশের প্রতি) আমি চললাম বাজারে। তোমরা দুটিতে ততক্ষণ গল্প কর। (কনুর বিস্ময়)

(গালে কম্ফার্টার বাঁধিতে-বাঁধিতে মেজকাকার প্রস্থান)

কনু। (চেয়ারের কাছে আসিয়া) স্নান করতে চল, রমেশ-দা।

রমেশ। (যেন এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, সহসা চোখ কচলাইয়া) হাঁ,

এই যাচ্ছি—(নিচু হইয়া ব্যাগটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) চললাম, কনু। ক'টা বেজেছে এখন ?

কনু। (ব্যাগসমেত রমেশের হাত ধরিয়া) চললে মানে ? আমি তোমাকে স্নান করতে যেতে বলছি।

রমেশ। (হাত ছড়াইয়া নিয়া) তোমার মেজকাকা কোথায় ? গলায় ফের কম্ফার্টার জড়িয়েছেন ? (রমেশ দুয়ারের দিকে পা বাড়াইল।)

কনু। সে কি রমেশ-দা, তুমি চললে কোথায় ? মেজকাকা তোমার জন্য দোকানে খাবার আনতে গেছেন। (রমেশের স্বল্প হাসি) এখন এ বাড়িতে খালি আমি আর তুমি—আর কেউ নেই। (হাসিয়া) মেজকাকা আমাদের গল্প করবার অনুমতি দিয়ে গেছেন। আর, (একটু থামিয়া) তারো চেয়ে বেশি। তুমি বোস রমেশ-দা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রমেশ। তুমি কী বাধ্য মেয়ে, কনু। মেজকাকার কাছ থেকে অনুমতি পেয়েই তোমার এখন মনে হচ্ছে যে আমার সঙ্গে তোমার কথা আছে। কিন্তু, তোমার সঙ্গে আমারো তো কিছু কথা থাকা উচিত, নইলে সে-গল্প জমে না—আমার তেমন কোনো কথা আর নেই, কনু। অতএব আমি চললাম। পথ ছাড়।

কনু। সত্যি, এখন যেয়ো না, আর একটু বোস—তোমাকে সে-কথা জানাবার সুযোগ আজ এসেছে—

রমেশ। আগে আরো অনেকবার শুনেছি, আর কৌতূহল নেই। হিঙের কচুরিগুলি তুমি একলাই খেয়ো। (গম্ভীর হইয়া) অত কাছে সরে এস না, কনু—আমার পকেটে কি আছে তা এত শিগগিরই ভুলে গেলে নাকি ?

পকেটে হাত দিল। কনু একটু সরিয়া পিছাইয়া গেল। রমেশ ব্যাগটা লইয়া বাহির হইয়া গেল—চুল রুক্ষ, মুখ শ্রান্ত, শরীর ধূলিম্লান। কনু খানিকক্ষণ খোলা দরজা দিয়া বারান্দার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। একটি সম্পূর্ণ মিনিটব্যাপী নিবিড় স্তব্ধতা।

যবনিকা

উপসংহার

পাত্র - পাত্রীগণ

স্বামী

স্ত্রী

ভূত

দৃশ্য : স্বামীর লিখিবার ঘর। সময় : মধ্যরাত্রি।

পর্দা উঠিতেই দেখা গেল ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসিয়া সন্নিহিত টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্বামী প্রকাণ্ড একটা খাতায় কি-সব লিখিতেছেন। ঘরটি ছোট, তিনটি জানালা আছে, তিনটিই খোলা। টেবিলের উপর স্ট্যাণ্ডে নীল কাচের শেড-দেওয়া ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প জ্বলিতেছে। টেবিলে ফাউন্টেন পেন হেলান দিয়া রাখিবার জন্য সমুদ্রের একটা কড়ি ও একটা য়্যাশ্‌-ট্রে ছাড়া আর কিছু আবর্জনা নাই—ছাইদানির হাতলে একটা অর্ধদগ্ধ চুরুট। সামনের দেয়ালে য়্যাব্রাহাম লিঙ্কনের একখানি বড় ছবি। ইহা ছাড়া ঘরে আর কোনোই আসবাব নাই। পশ্চিমের জানালাটির কাছে মেঝের উপর তরল একটু জ্যোৎস্নার আভাস পাওয়া যায়।

নিস্তব্ধ নির্জন ঘর—কোথা হইতেও একটি শব্দ আসিতেছে না। অপরিমেয় প্রশান্তি ; কান পাতিয়া থাকিলে হয়তো মুহূর্তগুলির পদধ্বনি শোনা যাইবে।

খাতার পাতা উল্টাইয়া স্বামী লিখিয়া চলিয়াছেন। ধীরে-ধীরে দু'টি লাইন লিখিয়া হঠাৎ, কিছু ভাবিয়া লইবার জন্য, থামিলেন। পেনটা কড়ির গায়ে হেলান দিয়া রাখিলেন ; চুরুটটা তুলিয়া টানিয়া দেখিলেন নিভিয়া গিয়াছে। দেরাজ হইতে দেশলাই বাহির করিয়া চুরুটটা ধরাইয়া পেনটা আঙুলের মধ্যে নাড়িতে-নাড়িতে কতক্ষণ কি ভাবিয়া আবার খাতার উপর ঝুঁকিলেন, কিন্তু একটি লাইন লিখিয়াই কাটিয়া ফেলিতে হইল। পেনটা টেবিলের উপর আস্তে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঘরের মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত যেন নিষ্ফল আক্রোশে পাইচারি করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে এইবার স্পষ্টতর রূপে দেখা গেল। খর্বাকৃতি বলিষ্ঠ মানুষটি, চাপা নাক, জোরালো চিবুক, প্রশস্ত উন্নত ললাট, দুই চোখে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ। গায়ের গরমের জামার বুকের দিকটা লিখিতে-লিখিতে কখন অন্যমনস্ক অবস্থায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, মাথার চুল দীর্ঘ না হইলেও অবিন্যস্ত—দেখিলেই কি-রকম উদাস ও উন্মত্ত মনে হয়। একবার জানলার কাছে মুখ বাড়াইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন—পাছে বাহিরের চন্দ্রালোকিত জগৎ তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। ঘরের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া দুই মাংসল বাহু প্রসারিত করিয়া কিছুকাল ব্যায়াম করিলেন, পরে দুই মুঠিতে মাথার চুলগুলি লইয়া মাথাটা সজোরে ঝাঁকিয়া দিলেন—মস্তিষ্ক যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে!

খালিপায়েই পাইচারি করিতেছেন—টেবিলের নিচে চটিজুতাজোড়া দেখা যায়।

জানালা দিয়া পুনর্নির্বাপিত চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

বিড়বিড় করিয়া কি বকিলেন কিছু বোঝা গেল না। পেনটা তুলিয়া লইলেন বটে, কিন্তু তাহার পর কি লিখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের উপর অন্যমনস্ক চিত্তে পেন-এর নিবটা বারে-বারে ঠুকিতে লাগিলেন।

সহসা বিদ্যুৎ-বিকাশের মত নবীন কোনো ভাবোদয় হইল বুঝি। আনন্দে অস্ফুট চিৎকার করিয়া ফের খাতার উপর দ্বিগুণ আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় বাহির হইতে ভেজানো দরজা ঠেলিয়া স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। সামান্য যা একটু শব্দ হইল তাহাতে স্বামীর ধ্যান ভাঙিল না।

ইংরেজি ব্রুনেট বর্ণের মেয়ে—শ্যামা, লাবণ্যললিতা। গায়ে সাদাসিধে একটি সেমিজ, তাহার উপর আটপৌরে একখানা শাড়ি—এইমাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন বলিয়া পারিপাট্যহীন। বিকালের খোঁপা মধ্যরাত্রে পিঠের উপর খসিয়া পড়িয়াছে। মুখে বিরক্তির ভাব, চোখে অনিদ্রাজনিত অস্থিরতা। বয়স কুড়ির বেশি হইবে না, দেখিলে নববিবাহিতা বলিয়া মনে হয়। মিলনের প্রথম সঙ্কোচ দূর হইয়া এখন বন্ধুতার নিবিড়তা ঘটিয়াছে—মেয়েটির অকুণ্ঠ আবির্ভাবেই তাহা ধরা পড়িল। সাধারণ বাঙালি মেয়ে—অথচ কোথায় যেন একটা বুদ্ধিরঞ্জিত তেজস্বিতা আছে বলিয়া মনে হয়।

স্ত্রী। (দরজা হইতে দুই পা আগাইয়া আসিয়া) তুমি আজ আমাকে ঘুমুতে দেবে না নাকি?

স্বামী। (বাঁ হাত অল্প একটু তুলিয়া স্ত্রীকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াই চলিলেন।)

স্ত্রী। (টেবিলের কাছে আসিয়া পিছন হইতে স্বামীর ডান হাত চাপিয়া ধরিয়া) আজ চোখে কি ঘুম নেই?

স্বামী। (ঘাড় ফিরাইয়া) বিরক্ত কোরো না, মিনু।

স্ত্রী। এখন রাত কত জান?

স্বামী। রাত কত জানবার আমার কৌতূহল নেই। এটা রাত কি না, তাই আমার এতক্ষণ জ্ঞান ছিল না। যাও, শেষ না করে আমি উঠছি নে।

স্ত্রী। তা হলে আমিও সত্যাগ্রহ সুরু করে দেব। অনবরত তোমার চুলে আর কানের ডগায় এমন সুড়সুড়ি দেব যে তুমি খাতার ওপর ঘুমিয়ে পড়বে।

স্বামী। (মুখ না তুলিয়াই) ঘুম? পাগল! তোমার বিধাতাকে ঘুমুতে বল গে। বল গে, রাত অনেক হয়েছে, আর তারা ফুটিয়ে কাজ নেই। এবার বিশ্রাম কর।

স্ত্রী। (হাসিয়া) অনেক আগেই তাঁর বিশ্রাম করা উচিত ছিল; তা হলে তোমার মতন এমন অকর্মণ্যদের এনে পৃথিবীকে অযথা ভারগ্রস্ত করতেন না।

স্বামী। আর, তুমিও চিরকাল কায়াহীন হয়ে থাকতে।

স্ত্রী। বেঁচে যেতাম! এখন ওঠ দেখি। বড় ঘড়িতে আড়াইটের শব্দ শুনে উঠে এসেছি। রাত জাগলে বিধাতার পেট ফাঁপে না—তিনি চোখ বুজলে কারুর বিধবা হবার ভয় নেই। ওঠ!

স্বামী। (গম্ভীর) বিরক্ত কোরো না, মিনু। তোমাকে শান্তিতে ঘুমুতে দেবার জন্যেই ঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছি। যাও।

স্ত্রী। আমার একা-একা ভয় করে যে! তা হলে এখানে তোমার সঙ্গে গল্প করে রাতটা কাটিয়ে দিই, কি বল!

স্বামী। না। তুমি তোমার ঘরে যাও। তোমার উপস্থিতি এখন আমার পক্ষে অসহ্য। স্বামার সাধনার বাধা হয়ো না, মিনু।

স্ত্রী। ছাই সাধনা। দেব সব খাতা-পত্র ছিঁড়ে, হাওয়ায় উড়িয়ে! (খাতায় হাত দিল)

স্বামী। (কর্কশ) মিনু। (বিরাম)

স্ত্রী। কী হবে এই সব মাথামুণ্ডু লিখে। নোবেলপ্রাইজ চাও না কি? যা লিখেছ, তাতেই হবে, কাল সকালে উনুন ধরাবার আগে তোমাকে একটা ঘুঁটের মেডেল উপহার দেব'খন। চল।

স্বামী। তুমি নেহাৎই সেকেলে, বাজে, স্টুপিড। তুমি সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্য কী বুঝবে?

স্ত্রী। তার চেয়ে একটা নেকলেস-এর মূল্য বুঝতাম। হ্যাঁ, ঠিক

কথা, বাবার চিঠির জবাব দিয়েছ? বিকেলে ঠাকুরঝিদের বাড়ি গেছলে?

স্বামী। তোমার ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে কথা বল গে। আমাকে একা থাকতে দাও। তোমার আবির্ভাবে আমার ঘর অপবিত্র হয়ে উঠেছে। আর্ট শুচিতা ও স্তব্ধতা পছন্দ করে।

স্ত্রী। তোমার আর্টের মাথায় ঝাঁটা মারবার জন্যেই তো আমার আবির্ভাব! (পেনটা কাড়িয়া) নিলাম এই কলম কেড়ে!

স্বামী। (চটিয়া) এটা ইয়ার্কি করবার সময় নয়।

স্ত্রী। ঘুমুবার সময়।

স্বামী। (স্ত্রীর হাত হইতে পুনরায় কলম ছিনাইয়া) তুমি ঘুমোও গে, যাও; আমার আর আকাশের চোখে আজ ঘুম নেই।

স্ত্রী। বাজে কবিত্ব করো না বলছি।

স্বামী। সত্যি, তুমি আমাকে হঠাৎ স্পর্শাতীত কল্পনালোক থেকে একেবারে শুকনো কঠিন মাটিতে নামিয়ে এনেছ—

স্ত্রী। আমার তা হলে বাহাদুরি আছে। তবু তুমি আমার মূল্য বুঝলে না। (হাসিয়া) আমার একজনের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল, কাল গেজেট খুলে দেখলাম ডেপুটি হয়েছে, সে নিশ্চয়ই আমাকে মাথায় করে রাখত, আর মাথা থেকে নামিয়ে মোটরে। নাম শুনবে? তা বলছি নে।

স্বামী। (কথা কানে না তুলিয়া) সেই বিস্তীর্ণ রাজ্যে আমি আর বিধাতা মুখোমুখি বসে সৃষ্টি করছিলাম; তুমি কেন সেই তপস্যার বিঘ্ন হলে?

স্ত্রী। (একটু সরিয়া) এখন তো দিব্যি আমার মুখোমুখি বসেছ? আমি তোমার বিধাতার চেয়ে সুন্দর নই?

স্বামী। যশোবন্ত সিংহ হেরে এলে মহামায়া তাঁকে দুর্গে ফিরতে

দেন নি। এমন বীরত্ব তোমার নেই কেন? আমার সৃষ্টির উৎসে তোমাকে উৎসাহ-রূপে পাই না বলে দুঃখ হয়। কেন তুমি মহামায়ার মত বলতে পারবে না, উপন্যাস অসমাপ্ত রেখে এলে কক্‌খনো ঘুমুতে দেব না আজ?

স্ত্রী। (হাসিয়া) তোমার জন্যে যে আমার মহা মায়া! সারা রাত জেগে কাল যখন তোমার বুকের ধড়ফড়ানি সুরু হবে তখন আমাকেই তো মকরধ্বজ মেড়ে দিতে হবে।

স্বামী। (খাতাটা তুলিয়া) এ লিখে যদি আমি মরেও যাই মিনু, তবু আমার এ কীর্তির মধ্যে আমি চিরকাল বেঁচে থাকব।

স্ত্রী। একটা প্যারাডক্স বললে বটে, কিন্তু ভারি খেলো ছেলেমানাস হয়ে গেল।

স্বামী। এমন একটা মহৎ কীর্তির কাছে তুচ্ছ স্বাস্থ্য, তুচ্ছ আয়ু, তুচ্ছ তোমার বৈধব্য।

স্ত্রী। বল কি। কত টাকার লাইফ-ইনসিওরেন্স করেছ?

স্বামী। আমি এখন উপন্যাসের খুব একটা কঠিন জায়গায় এসে ঠেকেছি। আর এক পৃষ্ঠা লিখলেই শেষ হয়, এবং এই শেষ পৃষ্ঠার ওপরেই উপন্যাসকে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

স্ত্রী। তবে এই শেষ পৃষ্ঠা লিখে কাজ নেই। যতগুলি পৃষ্ঠা লিখেছ তা দিয়ে দিব্যি আগুন করে তোলা-উনুনে চা করি এস।

স্বামী। (খাতার পাতা উলটাইয়া চিন্তিত ভাবে) তারাপদকে মারতেই হবে। তুমি কী বল?

স্ত্রী। কে তারাপদ?

স্বামী। আমার উপন্যাসের নায়ক।

স্ত্রী। ও হরি! (হাসি)

স্বামী। বোকার মত হাসলে যে বড়? তারাপদ কারো নাম হয়

না? পেলবকুমার বা ললনালোভন না হলে বুঝি তোমাদের মন ওঠে না, না?

স্ত্রী। ঐ রকম যার নাম, তাকে মেরেই ফেলা উচিত। (যেন একটু ভাবিয়া) হ্যাঁ, আমার সায় আছে।

স্বামী। (চকিত) কি বললে?

স্ত্রী। বললাম, পেট ফেঁপে নিজে মরার চেয়ে মনে-মনে কলমের নিব দিয়ে অন্য লোককে মেরে ফেলায় কৃতিত্ব বেশি। ঝঞ্ঝাট কম।

স্বামী। (গম্ভীর) তুমি বড্ড ফাজিল হয়েছ, মিনু। মান্য করে কথা বলতে শেখ।

স্ত্রী। (নিজেকে শুধরাইবার চেষ্টায়) আচ্ছা। শ্যামাপদকে কেন মারবে? তার অপরাধ?

স্বামী। শ্যামাপদ নয়, তারাপদ।

স্ত্রী। হ্যাঁ, তারাপদ। ঐ ছোটখাট ভুলে কিছু এসে যাবে না। ওর নাম তারিণীপ্রসাদ হলেও চলত।

স্বামী। (ধমকের সুরে) চলত না। নামে একটা য়্যাটমসফিয়ার আছে।

স্ত্রী। (সায় দিয়া) আচ্ছা, আছে। কিন্তু নামের জন্যেই বেচারাকে মারতে হবে? বেচারার বিয়ে দিয়েছিলে? বৌয়ের নাম কী রেখেছ শুনি? ভবতোবিণী?

স্বামী। তা হলে গল্পটা তোমাকে বলি। (খাতাটা খুলিল)

স্ত্রী। (অনুনয় করিয়া) সংক্ষেপে। তার চেয়ে আরেক কাজ করলে আরো ভালো হয়।

স্বামী। কি?

স্ত্রী। তারাপদর মৃত্যুটা যদি সংক্ষেপে সেরে ফেলতে পার তা হলে দুজনেই তাড়াতাড়ি ঘুমুতে যেতে পারি।

স্বামী। কিন্তু তারাপদকে কেনই বা মারব?

স্ত্রী। সে-ও একটা কথা বটে! কেনই বা মারবে?

স্বামী। গল্পটা আগাগোড়া না শুনলে তুমি কিছুই বুঝবে না। (পড়িতে উদ্যত হইল)

স্ত্রী। (ভয় পাইয়া) রক্ষে কর, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তারাপদকে মারতেই হবে—এতে আর কথা নেই। তোমার স্বাস্থ্য ও আমার সুনিদ্রার জন্যে মরতে ওর একটুও আটকাবে না। ফেল না মেরে।

স্বামী। তারাপদ ভাগ্য কর্তৃক পদে-পদে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হয়েছে। ওর গৃহ নেই, আশ্রয় নেই, পাথেয় নেই। ওর জন্যে মা'র স্নেহ নয়, প্রিয়ার প্রেম নয়, বন্ধুর অনুরাগ নয়। ও জীবনের একটা মূর্তিমান বিদ্রূপ, স্রষ্টার ভয়াবহ বৈফল্য!

স্ত্রী। (যেন একটু ভাবিয়া) তবে এক কাজ কর। আমার মত একটি ভালো মেয়ে দেখে ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করুক।

স্বামী। এত বড় একটা জীবনের এই শোচনীয় পরিণাম! তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, মিনু।

স্ত্রী। বিনা দামে এত সব মূল্যবান পরামর্শ দিলাম কি না—

স্বামী। ওর জন্যে মৃত্যু—মহান মৃত্যু। সুষুপ্ত সমুদ্রের মত সুগম্ভীর। মৃত্যুই ওর জীবনের পরম পরিপূর্ণতা!

স্ত্রী। ঠিক। বিয়ে দেওয়ায় ঢের হাঙ্গাম—গল্প আবার বাড়তে চায়। সব কথা তখনো ফুরোয় না। ছেলেপিলে আসে, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া-ঝাটি সুরু হয়—নানান রকম ফ্যাকড়া জোটে। তার চেয়ে মেরে ফেলাটা ঢের সোজা—এক কথায় ল্যাঠা চুকে যায়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায় তা হলে।

স্বামী। কিন্তু কিসে তাকে মারব?

স্ত্রী। (যেন চিন্তিত) সেইটেই সমস্যা বটে। গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দাও না!

স্বামী। ছি! আমি এখন একটা মৃত্যুবর্ণনা করব, ভিক্টর হিউগোর পর তেমনটি আর পৃথিবীর সাহিত্যে লেখা হয় নি।

স্ত্রী। (সরাসরি ভাবে) তা হলে এক কাজ কর। ওর পেটে এক রাজ্যি পিলে দিয়ে কালাজ্বরের রুগী করে ওর পাতে বাঙালি-মৃত্যু পরিবেশন কর। ভারি রিয়ালিস্টিক হবে।

স্বামী। তুমি এই ঘটনার গাম্ভীর্যকে সম্মান করতে পারছ না। মাথা ঘুলিয়ে উঠছে।

স্ত্রী। মকরধ্বজ নিয়ে আসব? না য়্যাসপিরিন?

স্বামী। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া) লেখকের পক্ষে এ বড় কঠিন সমস্যা। সে নিষ্ঠুর, নির্বিকার, অপক্ষপাত। (একটু পাইচারি করিয়া) তারাপদকে মারতেই হবে।

স্ত্রী। আমার একটা সদুপদেশ শুনলে ভালো করতে। তারাপদকে মারলে তোমার বইও মাঠে মারা পড়বে। বিয়ের উপহারের জন্যে বিক্রি হবে না 'ফুলশয্যা' নাম দিয়ে তারাপদর সঙ্গে ভবতোষিণীর বিয়ে দিয়ে উপন্যাসের ইতি করো। ওরাও ঘুমুক, আমরাও ঘুমুই।

স্বামী। (পাইচারি করিতে-করিতে) লেখকের দায়িত্ব অপরিসীম, মিনু; তুমি তা বুঝবে না। লেখকের জন্যেই পাঠক, পাঠকের জন্যে লেখক নয়। তারাপদের মৃত্যু পৃথিবীর লোক বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উপভোগ করবে—সে-মৃত্যু সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটা নূতনতর উপলব্ধি!

স্ত্রী। তা হলে এক কাজ কর। ওকে হিমালয়ের চূড়ায় চড়িয়ে ছেড়ে দাও; ও গড় গড় করে গড়িয়ে এসে ভারত মহাসমুদ্রে তলিয়ে যাক।

স্বামী। (চটিয়া) তোমাকে এখানে বসে আর বকবক করতে হবে না। (ধমক দিয়া) যাও। মেয়েমানুষ হয়ে তুমি আর কী বুঝবে? আমার না হয়ে কোনো কেরানির ঘরণী হলেই তোমাকে মানাতো।

স্ত্রী। আমার জীবনোপন্যাস শেষ করবার আগে বিধাতা যদি তোমার মতো আমার কাছে এসে পরামর্শ চাইতেন, তা হলে আমি কবি ছেড়ে হয় তো কেরানিকেই বেছে নিতাম। তার আর চারা নেই। যাই হোক, লাগবে য়্যাসপিরিন?

স্বামী। ইয়ার্কি করো না, মিনু। এখন আমি একা—মর্তলোকের কোনো বন্ধন আমার নেই, আমি একটা শরীরী আত্মা শুধু! একমাত্র অদৃশ্য মহাকাল আমার সঙ্গী।

স্ত্রী। শুধু য়্যাসপিরিনে হবে না। কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে আনব?

স্বামী। (চমকিত) কেন?

স্ত্রী। মাথাটা তোমার ধুয়ে দিতাম। বাক্সে অ-ডি-কোলন আছে।

স্বামী। কথার অবাধ্য হয়ো না, মিনু; ঘুমুতে যাও। দেহের সেবা-দাসীর চেয়ে আত্মার ঘরণীকে আমি বেশি ভালোবাসি।

স্ত্রী। কে সে?

স্বামী! সে আমার আর্ট—আমার কলালক্ষ্মী! আমাদের নিভৃত মিলনকে দীর্ঘতর হতে দাও।

স্ত্রী। বটে! আমি কেউ নই?

স্বামী। এই মুহূর্তে তুমি আমার কেউ নও। অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ! তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবারো আমার ইচ্ছা নেই। তোমাকে আমি ভুলে গেছি।

স্ত্রী। বটে! এমন সতীনকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। (হাসিয়া) যেবটা প্রেমের স্বাস্থ্যের পরিচয়, না?

স্বামী। কাল সকালের আলোতে আমি তোমার কাছে দেখা দেব—সেই পরিচিত্ত সীমাখণ্ডিত মানুষ। কিন্তু আজকের রাতেই আমার সত্যিকারের পরিচয়; যদি পার, চিনে রাখ, মিনু। •

স্ত্রী। চোখ বড করে অমন ভাবে কথা কয়ো না, বলছি। আমার ভয় করে।

স্বামী। রাত্রি আমাকে রহস্যময় করেছে। মিনুর স্বামী বলে আজ আমার পরিচয় নয়, বেদের সংজ্ঞানুসারে আমি কবি, স্রষ্টা। বিধাতার সমকক্ষ।

স্ত্রী। বিধাতার ছোট ভাই। বাঁচলে হয়!

স্বামী। (দারুণ চটিয়া) যাও!

স্ত্রী। (আহত ও করুণ) বকছ কেন?

স্বামী। যাও।

(পর্দা ঠেলিয়া অভিমানভরে স্ত্রীর প্রস্থান)

ইহার পরে কতক্ষণ বিরাম। স্বামী চেয়ারে বসিয়া দেরাজ হইতে চুরুট ও দেশলাই বাহির করিলেন; চুরুটটা ধরাইয়া আবার খানিকক্ষণ পাইচারি করিয়া লইলেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যখানে দাঁড়াইলেন, মাথায় নূতন কোনো আইডিয়া আসিয়াছে নিশ্চয়; তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া চেয়ারে গিয়া বসিয়া পেনটা খুলিতেছেন—সহসা ঘরের ইলেকট্রিক আলো নিভিয়া গেল। তার ফিউজড হইয়া গিয়াছে। আলো নিভিবার সঙ্গে-সঙ্গেই খোলা জানলা দিয়া এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের মেঝেতে ও দেয়ালে লুটাইয়া পড়িল। জ্যোৎস্নায় অন্ধকার একটু তরল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী। (আপন মনে) এই যাঃ। কি হবে? (উচ্চৈস্বরে) মিনু! মিনু! (দেরাজ টানিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে—অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে) একটা মোমবাতিও বা যদি কোথাও থাকে! এমন সময়টায় আলো নিভে গেল! (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দরজার পর্দার কাছে গিয়া চেঁচাইয়া) মিনু! মিনু! (একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা)

সেই মুহূর্তেই আবার সহসা ঘরের মলিন জ্যোৎস্নাটুকু বিতাড়িত করিয়া ইলেট্রিক আলো জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত ঘর আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী একটা স্বস্তি-সূচক অস্ফুট শব্দ করিয়া দরজা হইতে ফিরিলেন; চেয়ারের দিকে পা বাড়াইতেই ভীষণ চমকাইয়া উঠিলেন—তাঁহার চেয়ারে একটি অপরিচিত লোক বসিয়া আছে।

লোকটির বয়স ত্রিশের কাছাকাছি—অত্যন্ত শীর্ণ চেহারা, দেখিলেই রোগগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়। ছিন্ন অপরিচ্ছন্ন কাপড় পরনে, গায়ের শার্টটা বুকের দিকে অনেকটা লম্বালম্বি ছেঁড়া, একমাত্র গলার বোতামটাই আটকানো। মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল—কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চক্ষু দুইটি কোটরপ্রবিষ্ট—ভারি অবসন্ন দৃষ্টি। চেহারা দেখিয়া ঘৃণা হয় না, করুণা হয়। লোকটি চেয়ারে খাতার পৃষ্ঠা উলটাইয়া কি সব দেখিতেছে।

স্বামী। (চমকিত ও ভীত) কে? কে তুমি?

ভূত। (অল্প হাসিয়া) চিনতে পাচ্ছেন না?

স্বামী। (দৃঢ়স্বরে) না। কি চাও তুমি এখানে? (চারিদিক চাহিয়া) কোত্থেকে এলে? বল, তুমি কে?

ভূত। ভালো করে চেয়ে দেখুন। এই ছেঁড়া জামা-কাপড়, এই রোগা কাহিল দেহ, (পকেট উলটাইয়া) এই শূন্য পকেট, (জুতা দেখাইয়া) এই হাঁ-করা জুতো—চিনতে পাচ্ছেন না?

স্বামী। না।

ভূত। (কাশিয়া) এই দেখুন কাশছি, (কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া) রক্ত উঠছে—চিনতে পাচ্ছেন না এখনো?

স্বামী। (অস্থির) না। কে তুমি?

ভূত। আশ্চর্য! এতদিন ধরে নিভৃতে বসে যার ছবি আঁকলেন, যাকে নিয়ে আপনার সৃষ্টির অহংকার, তাকে আপনি চিনতে পারবেন না?

স্বামী। (বিচলিত) তুমি—তুমি—

ভূত। হ্যাঁ, আমি তারাপদ। আপনার উপন্যাসের ব্যর্থ লাঞ্ছিত মুমূর্ষু তারাপদ।

স্বামী। তারাপদ! (দুই পা পিছাইয়া গেলেন)

ভূত। হ্যাঁ, তারাপদ! আমাকে আপনার ভয় করবার কিছু নেই। (নম্রস্বরে) আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

স্বামী। কী কথা? (চারিদিক চাহিয়া—চমকিত অবস্থায়) কোত্থেকে এলে তুমি?

ভূত। আপনার ভাবরাজ্য থেকে। সমস্ত আকাশ সাঁতরে।

স্বামী। এই মধ্য রাত্রে? কী করে পথ চিনলে?

ভূত। আকাশের কোটি-কোটি তারা ইসারায় আমাকে পথ চিনিয়ে দিয়েছে। মধ্য-রাত্রে এলাম, কারণ আজ আপনি নিঃসঙ্গ, আপনার আজ প্রচুর অবকাশ, এ-ঘরে আজ প্রগাঢ় স্তব্ধতা। তা ছাড়া—

স্বামী। তা ছাড়া—

ভূত। তা ছাড়া আজ এখুনিই আমার জীবনের ওপর শেষ কালো যবনিকা নেমে আসছিল। ভাবলাম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। (ব্যস্ত হইয়া) আপনার সঙ্গে আমার ঢের কথা আছে।

স্বামী। (একদৃষ্টে ভূতের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) তোমাকে দেখলাম, ভালোই হল। কিন্তু তোমার যে এমন দুর্দশা হয়েছে, ভাবিনি। (পূর্বকথা স্মরণ করিয়া) ফরবেশগঞ্জে সেই চাকরি খুইয়ে সাত দিন ধরে উপোস করে আছ?

ভূত। আমার এই দুর্দশা কে করেছে?

স্বামী। কে করেছে?

ভূত। কে করেছে! (টেবিলে কিল মারিয়া) আপনি।

স্বামী। আমি নই তারাপদ, তোমার ভাগ্য। ঘটনার চাকার তলায় ফেলে ভাগ্য তোমাকে নিষ্পেষিত করছে।

ভূত। (ক্ষেপিয়া) ভাগ্য? আমার এই ভাগ্য কে তৈরি করলে শুনি?

স্বামী। তুমি নিজে।

ভূত। (ব্যঙ্গপূর্বক) আর আপনি কী করছিলেন?

স্বামী। (উদাসীন) আমি? আমি নির্বিকার, নিরপেক্ষ—নেপথ্যে বসে তোমার জীবনকে যথাযথ বর্ণনা করাই আমার কাজ। তোমাকে খুব শ্রান্ত দেখাচ্ছে—চা খাবে?

ভূত। আপনি নির্বিকার বলেই আমার জীবনের কী পরিণতি হবে তারি জন্যে মাথা ঘামাচ্ছেন! তবে এইখানেই আমাকে ছেড়ে দিন।

স্বামী। না। তুমি যেখানে এসে পৌঁচেছ সেখান থেকে আর তোমার ফেরবার পথ নেই। মৃত্যুই তোমার বিশল্যকরণী!

ভূত। (সোজা হইয়া) আমাকে মরতে হবে? কেন?

স্বামী। (একটু পাইচারি করিয়া নিয়া) কেন, তার আবার কারণ কি? এত নিদারুণ দুঃখের পর মৃত্যুই মধুর! তোমার জীবনের মহৌষধি! (পাইচারি করিতে-করিতে) কেন মরবে? মরতে তোমাকে হবে। এ রকম অবস্থায় মানুষে মরলে ভারি মানায়!

ভূত। (চেঁচাইয়া) ককখনো না। আমি মরব না। আমি বিদ্রোহ করব।

স্বামী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রাগে তাঁহার চোখ জ্বলিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু মনে অজানিত কি-একটা ভয় ছিল বলিয়া কণ্ঠস্বরে সেই রাগ যথোচিত প্রকাশ পাইল না।

স্বামী। (হাতের চুরুট দিয়া ইসারা করিয়া) তোমার সঙ্গে আমার তর্ক করবার সময় নেই। যাও।

ভূত। আমি চলে যাবার জন্যে আসিনি।

স্বামী। (স্তম্ভিত) কী চাও তা হলে?

ভূত। জবাবদিহি চাই।

স্বামী। কিসের?

ভূত। আমার জীবনকে এমন বিশ্রী, বাজে করে শেষ করবেন কেন—তার।

স্বামী। তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ করবার কথা নয়।

ভূত। কিন্তু মরে আমি আপনার বাজে খেয়াল মেটাব না। না।

স্বামী। (একটু হাসিয়া) কিন্তু না মরে তোমার উপায় কি? তোমার ঘর নেই—

ভূত। (থামাইয়া) পথ আছে।

স্বামী। খাদ্য নেই। (ভূতের প্রতিবাদ শুনিবার আশায় একটু থামিলেন।) তা ছাড়া, এই খানিক আগে তোমার কাশি হচ্ছিল, তুমি রক্ত মছছিলে। (সদর্প) না মরে তোমার আর কী করবার আছে?

ভূত। (নিরাশ) তার জন্যে আমাকে এমনি অসহায় অকর্মণ্য হয়ে রোগে ভুগে মরতে হবে?

স্বামী। (তেজস্বী) না। জানি, ও-রকম মৃত্যু তোমার জীবনের কলঙ্ক—ওই মৃত্যু তোমার দুঃখের পক্ষে অপমানকর। তোমার মৃত্যু মহান, গৌরবময়। তুমি আত্মহত্যা করবে।

ভূত। (চমকিয়া) আত্মহত্যা!

স্বামী। হাঁ, আত্মহত্যা।

ভূত। (কঠিন) এই আপনার গৌরবময় মৃত্যুর উদাহরণ? আমি কি এত কাপুরুষ? আমার চরিত্র কি এত নির্জীব, এত দুর্বল?

স্বামী। না, অতিমাত্রায় ট্র্যাজিক্যাল। তুমি আত্মহত্যার চেষ্টা করবে, কিন্তু তিন দিন হাসপাতালে পড়ে থেকে ফের বেঁচে উঠবে।

ভূত। (উৎফুল্ল) বেঁচে উঠব? যখন জ্ঞান হবে তখন দিন না রাত্রি?

স্বামী। শোনই না। বেঁচে উঠবে বটে, কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়বে।

ভূত। কেন?

স্বামী। নিজের প্রাণ নিতে চেয়েছিলে বলে। সে-ও তো হত্যা-ই।

ভূত। কই, নিজের প্রাণ নিতে চাই নি তো। পাগল। আমি করব আত্মহত্যা?

স্বামী। তারপর তোমার বিচার হবে। হাতকড়া বেধে তোমাকে আদালতে নিয়ে আসবে।

ভূত ভীত হইয়া তাহার দুই হাত দেখিতে লাগিল

শীর্ণ, পরিশ্রান্ত—দেখলেই মায়া হয়। কাঠগড়ায় যেই তুলতে যাবে তোমাকে, তুমি কনস্টেবলের কাঁধে ঢলে পড়েছ; তুমি আর নেই।

ভূত। না। না।

স্বামী। (তন্ময়) জীবন-পলাতককে কে বাঁধবে, বল? মরতে চেয়েছিলে বলে সমাজ তোমাকে আঘাত করতে চাবুক তুলেছিল, সেই চাবুক তারই [illegible] পড়বে। যার [illegible] শাস্তির আয়োজন, সেই হবে তার পরম পুরস্কার। তুমি মরতে [illegible] হবে না তার বিপদ। সমাজের প্রতি তোমার এই অভিশাপ।

ভূত। সমাজের [illegible] কেও [illegible] লোক আছে। (স্বামী চমকিত) সে আপনি: স্বা[illegible]।

স্বামী। আমি? আমি কি [illegible] ব[illegible]ই তোমাকে মৃত্যু উপহার দিচ্ছি। [illegible] কোমল।

ভূত। আমার মৃত্যুর বিনিময়ে আপনি কিছু কিনতে চান। আমি তা দেব না। (খাতা নিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) আমি বিদ্রোহী।

স্বামী। আমার বিরুদ্ধে?

ভূত। হ্যাঁ। সেই বিদ্রোহই আমার বাঁচা। আপনি মৃত্যুহীন, অনন্ত-আয়ু—মৃত্যুতে যে-বেদনা যে-অপমান নিহিত আছে, তা আপনি

কী বুঝবেন? বীরের মত সব দুঃখ আমি বুক পেতে সইব, কিন্তু পিঠ পেতে ভীরুর মত মার খেয়ে আমি মরতে পারবো না।

স্বামী। (চেয়ারে বসিয়া) খাতাটা আমাকে দাও।

ভূত। বলুন, মৃত্যু নয়—মানুষ যত দিন বাঁচতে পারে ঠিক ততদিনের আয়ু—সুদীর্ঘ, দুঃখময়—দিচ্ছি খাতা ফিরিয়ে। এই আকাশ আমার জন্যে খোলা থাক।

স্বামী। কিন্তু মৃত্যুর পরেও একটা জগৎ আছে, তারাপদ। সেখানে আকাশ ফুরিয়ে যায় নি। সেই অপরিচিত জগতে গিয়ে বাসা বাঁধবে ভেবে তোমার রোমাঞ্চ হয় না?

ভূত। না। কে জানে সেই জগতেও হয়তো আপনারই মত স্বেচ্ছাচারী সম্রাট আছে কেউ। (দৃঢ়স্বরে) আমি তা সইবো না। সেখানকার আকাশ অন্ধকার, হিম, কঠিন। আমার এই আকাশের সঙ্গে তুলনাই চলে না। এত এর সঙ্গে আত্মীয়তা, তবু অপরিচয়ের মোহ ঘুচল না। আপনি এখন ঘুমুন গে, আমি চললুম। (দুয়ারের দিকে পা বাড়াইল)।

স্বামী। (চেয়ার হইতে উঠিয়া) খাতা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

ভূত। পথে। সুন্দরতর ভবিষ্যতের সন্ধানে। (আরেক পা বাড়াইল)

স্বামী? (দৃঢ়স্বরে) খাতা ফিরিয়ে দিয়ে যাও।

ভূত দাঁড়াইল বটে, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

স্বামী। আমার হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই। কোথায় তুমি যাবে? অসীম আমার প্রতাপ, দুর্ধর্ষ আমার লেখনী। (টেবিল হইতে কলম তুলিয়া লইয়া) এই রাজদণ্ড কে কাড়বে? খাতা ফিরিয়ে দাও, তারাপদ। আকাশের দিকে চেয়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা তোমাকে শোভা পায় না।

ভূত। (আগাইয়া আসিয়া বিরস বিবর্ণ মুখে) আপনার এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমার কিছুই করবার নেই?

স্বামী। মৃত্যু ছাড়া কিছুই করবার নেই। (চেয়ারে বসিয়া) অত্যাচার নয়, তারাপদ, আশীর্বাদ।

ভূত। আমি মহাসমুদ্রের পারে চুপ করে বসে থাকতে চাই—

স্বামী। তোমাকে লাফিয়ে পড়তে হবে।

ভূত। না; পারে শুধু চুপ করে বসে থাকবো,—সামনে ফেনফণাময় মহাসমুদ্র, অস্থির, উদ্বেল। আকাশে কোটি-কোটি তারা, মর্ত্যে কোটি-কোটি জীবন। কী বিচিত্র! আমি সমস্ত গতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে চুপ করে বসে থাকব শুধু। আপনার এত বড় জগতে আমার জন্যে একটুকু স্থান হবে না? এত কৃপণ।

স্বামী। চলমান সৃষ্টির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখায় কৃতিত্ব কি? মৃত্যুও তো চলা।

ভূত। না, থেমে পড়া। যদি চলবার শক্তি না দিন, বিশ্রাম করবার ধৈর্য দিন। জল না দিন ক্ষতি নেই, কিন্তু পিপাসাটুকু কেড়ে নেবেন না।

স্বামী। সে-বাচায় লাভ কি? তুমি স্ত্রী-পুত্র সব গত বছরের বৈশাখী-ঝড়ে রাক্ষুসি পদ্মায় বিসর্জন দিয়েছ; শোকে তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ—

ভূত। তবু তাদের ভুলিনি। মরে তাদের ভুলতে চাইনে।

স্বামী। তোমার চাকরি নেই, সাত দিন থেকে তুমি নিরন্ন, উপবাসী। তার ওপর তোমার যক্ষ্মা হয়েছে।

ভূত। আপনি ইচ্ছা করলে আবার সব হতে পারে,—পদ্মা শুকিয়ে যেতে পারে, উপোস করে আমার যক্ষ্মা সেরেও যেতে পারে। আপনি ইচ্ছা করলে—পারে না?

স্বামী। পারে না।

ভূত একটা চিৎকার করিয়া উঠিল। চিৎকারটা মিলাইয়া যাইবার পর একটু স্তব্ধতা।

স্বামী। (যেন একটু নরম) তুমি এই বিশ্রী জীবন নিয়েই বা কী করবে? সুখ নেই, স্বাস্থ্য নেই, সংসার নেই।

ভূত। (উচ্ছ্বসিত) আশা, তবু আশা আছে। এই প্রকাণ্ড আকাশের নিচে ছোট একটি আশা নিয়ে তবু বেঁচে থাকব। দিন যাবে, রাত্রি হবে—আবার দিন আসবে না?

স্বামী। যদি না আসে? ফুটপাতে যে-সব ভিখিরি পড়ে থাকে, তাদের চেহারা তুমি দেখেছ?

ভূত। বেশ তো, ওদের মেরেই হাত পাকান। (কাকুতিপূর্ণ) আমাকে ছেড়ে দিন।

স্বামী। এই অবস্থায়?

ভূত। আপনি বলুন—মুহূর্তে আমার গা থেকে সমস্ত খোলস খসে পড়বে। মেঘলা-রাতের পর সজীব সূর্যের মত দেখা দেব। দেহে আমার উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, অন্তরে আমার সুধা-সমুদ্র। আপনি ইচ্ছা করলে রাক্ষুসি পদ্মা আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে—আপনি ইচ্ছা করলে—

স্বামী। আমার চেয়ে তোমার ইচ্ছার দৌড় যে বেশি দেখছি।

ভূত। বেশ, মরা লোককে দিতে না চান, চাইনে। কিন্তু যে-লোক মরতে চায় না, তাকে মেরে ফেলে তার মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করবার আপনার অধিকার নেই। আমাকে বাঁচতে দিন—বুক ভরে (নিশ্বাস নিবার ভঙ্গি করিয়া) নিশ্বাস নিতে দিন। এই নিশ্বাস নেবার হাওয়াটুকুর ওপর ট্যাক্স বসিয়ে আপনার লাভ কি?

স্বামী। তুমি বাঁচবে?

ভূত। হ্যাঁ, বাঁচবো। বেশি কিছু চাহিদা আমার নেই। একটি

ছোট গ্রামে একটি ছোট কুটির। জানলার ওপারে অকূল আকাশ! দেবেন? (হাত পাতিল)

স্বামী। এতটা পথ এসে তুমি এত সহজে এমনি উলটো ফিরে যাবে?

ভূত। ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। আমি আবার আমার শৈশব পেতে চাই। সহজ, পরিমিত জীবন; আকাশচারী ধূমকেতু না হয়ে একজন সামান্য সাধারণ কেরানি! স্বল্প আহার, স্বাস্থ্য, আর মাথা গোজবার জন্যে একটু আশ্রয়!

স্বামী। তোমার আবদার তো বেশ!

ভূত। আবদার নয়, দাবি। আমি এখুনি মরতে চাই না বেশ, দুঃখ দিন, কিন্তু তার অবসান নয়। কোটি-কোটি দুঃখের মধ্যে আমি জীবনকে অবিষ্কার করব। (হাত পাতিয়া) দিন, আপনার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে কত দুঃখ আছে দিন:

স্বামী। তোমার বাঁচতে এত সাধ?

ভূত। এত। আমার কণ্ঠে ভাষা দিয়েছেন বটে, কিন্তু ব্যক্ত করতে পারছি না।

স্বামী। বেঁচে কী করবে?

ভূত। জানি না; খালি বাচব। কান পেতে ধাবমান রাত্রির পদ-ধ্বনি শুনব।

স্বামী। আচ্ছা, দাও খাতাটা। (হাত বাড়াইলেন)

ভূত। (খাতা না দিয়া) অনেক দূর থেকে আসছি,—ভারি খিদে পেয়েছে। কিছু—

স্বামী। এত রাতে কোথায় মিলবে?

ভূত। এক গ্লাশ জল দেবেন? দারুন তেষ্টা পেয়েছে।

স্বামী। (চারিদিকে চাহিয়া) এ-ঘরে জলের কুঁজো নেই। মিনু ভিতরে ঘুমিয়ে আছে, তাকে আমি জাগাতে পারবো না।

ভূত। তখন যে ভারি চা খাওয়াতে চেয়েছিলেন !

স্বামী। তখন কেন জানিনা তোমার উপর আমার একটু করুণা হয়েছিল ; পরে ভেবে দেখলাম সে আমার দুর্বলতা। দাও খাতা, আমার সময়ের মূল্য আছে।

ভূত। কেন করুণা হয়েছিল শুনি ?

স্বামী। তোমার মাঝে আমি আমার নিজের শ্রান্তি দেখেছিলাম বোধ হয়—আমার নিজের বিফলতা ! হয় তো তুমি আমার বিফল সৃষ্টি ! দাও খাতা, মৃত্যুর প্রসাদে তোমাকে গৌরবান্বিত করব। বুঝলে তারাপদ, মৃত্যু মমতাময়ী ! (হাত বাড়াইলেন)

ভূত। দেব না খাতা ফিরিয়ে। আমার চোখের আয়ুর পিপাসা, (পদাঘাত করিয়া) আমি বাঁচবো। মরতে আমি শিখিনি।

স্বামী। দাও ; পঙ্গুতা জীবন নয়, তারাপদ। দাও, দেরি করো না।

ভূত। দেব না।

স্বামী। দাও। আমি নিষ্ঠুর, নির্মম। আমার কাছে ভিক্ষা কোরো না। ভিক্ষা করে নিজেকে অসম্মান করা তোমাকে শোভা পায় না। তুমি বীর, বীরের মতো মরবে

ভূত। (হাসিয়া) হ্যাঁ, বীর। বীরের মতো আমি বিদ্রোহ করব, বাঁচব। যদি পরিপূর্ণ জীবন না দেন, তবে দস্যুর মত আপনার থেকে আমি সব ছিনিয়ে নেব—স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য, সম্ভোগ—আপনার নিরুদ্বেগ ভবিষ্যৎ। আমার সঙ্গে আপনাকেও আকাশ-শেষের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়তে হবে।

স্বামী। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তুমি পারবে ? (কলম তুলিয়া) আমার অস্ত্র দেখেছ ?

ভূত। আমারো অস্ত্র আছে। (খাতা দেখাইল) আমার অসমাপ্ত জীবন !

স্বামী। (শ্রান্ত) আমার মাথা ঘুরছে। দাও শিগগির খাতাটা। এই রাত্রির ও-পারে তোমার জগৎ আর নেই, তারাপদ। কেন বৃথা বিরক্ত করছ। দাও। (চেয়ার হইতে উঠিলেন)

ভূত। (খাতাটা বুকের উপর আঁকড়াইয়া ধরিয়া) দেব না।

স্বামী। (চিৎকার করিয়া) দেবে না?

ভূত। (দৃঢ়) না।

স্বামী সহসা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তারাপদর টুঁটি চাপিয়া ধরিল।

স্বামী। দেবে না? তোমার এতদূর স্পর্ধা? তুমি আমার হাতের পুতুল, তোমাকে আমি দূর শূন্যে ছুঁড়ে মেরে তোমার পতন দেখব, ভেঙে গেলে করতালি দিয়ে উঠব। দেবে না। (খাতা ছিনাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিলেন)

ভূত নিমেষে [illegible] প্রয়াস করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল

ভূত। (চুল বিপর্য্যস্ত, চাহনি কর্কশ) তবে এই নিন—(খাতাটা দুই হাতে টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল)

স্বামী। (চীৎকার করিয়া) তারাপদ। তারাপদ। এ কী করলে?

ভূত। (দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া) আমি মুক্ত, জয়ী। চললুম। লোকালয় অন্ধকার করে দিন—

সহসা স্টেজ অন্ধকার হইয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া [illegible] রাশি-রাশি জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

স্বামী। (আকুল স্বরে) তারাপদ। তারাপদ। দাঁড়াও—

ভূত। (দুয়ারের কাছে আসিয়া) সময় নেই চললুম।

স্বামী। কোথায়?

ভূত। নব-জীবনের দেশে।

(ভূত অদৃশ্য হইয়া গেল)

স্বামী। (চিৎকার করিয়া) যেয়ো না, যেয়ো না, তারাপদ। দাঁড়াও।

ছুটিয়া তারাপদকে ধরিতে গিয়া চেয়ার ধরিয়া নিজেকে সামলাইলেন। চেয়ারে বসিয়া [illegible] দিকে অর্থহীন চোখে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর [illegible] গুঁজিয়া দিলেন।

চিৎকার শুনিয়া [illegible] প্রবেশ করিল। হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। [illegible] উদ্বেগ, কণ্ঠস্বর ভীত।

স্ত্রী। (স্বামীর মাথা নাড়িয়া) কী হ'ল? কী?

স্বামী। (ধীরে মাথা তুলিয়া) কে, মিনু?

স্ত্রী। চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

স্বামী। (স্ত্রীর বাঁ হাতখানি মুঠির মধ্যে ধরিয়া) এখন রাত ক'টা?

স্ত্রী। (মোমবাতিটা টেবিলের একধারে খাড়া করিয়া রাখিয়া) অনেক। এখনো ঘুমোতে যাবে না? চেঁচিয়ে উঠলে কেন? সবে একটু ঘুম এসেছিল, চীৎকার শুনে জেগে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে না। মেইন সুইচ অফ ক'রে দিলে কেউ? ঘরে চোর এসেছিল? দরজা তো বন্ধই আছে।

স্বামী। (স্ত্রীর হাতখানি আরো নিবিড় করিয়া ধরিয়া) মিনু।

স্ত্রী। (ভীত) কী হয়েছে তোমার? (টেবিলের উপর ছিন্ন পাণ্ডুলিপির দিকে নজর পড়িতে) এ কী, তোমার গল্পের খাতা না?

[illegible] স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্ত্রী। এ কী করেছ? ছিঁড়ে ফেললে? (ছিন্ন পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিলেন) [illegible]?

স্বামী। জান মিনু, সে এসেছিল।

স্ত্রী। (শঙ্কিত) কে?

স্বামী। তারাপদ।

স্ত্রী। তারাপদ?

স্বামী। হ্যাঁ, তারাপদ। এই ঘরে, আমার চোখের সামনে। দুঃখে শোকে রোগে দারিদ্র্যে ভীষণ বিকৃত হয়ে গেছে। দেখলে তোমার মায়া হত, মিনু। আমার কাছে এসে এক গ্লাশ জল চাইল ; আমি দিলুম না। বললুম, আমি নিষ্ঠুর, নির্মম ; ভিক্ষুককে আমি প্রশ্রয় দিই না। সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে। মরতে সে চায় না, সে মরবে না, মরতে সে শেখেনি। তার স্পর্ধাকে শাসন করতে গেলাম, সে দু'হাতে আমার খাতা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে দিয়ে গেল।

স্ত্রী। (বিচলিত, ভীত) কোথায়, কোথায় সে?

স্বামী। চলে গেছে।

স্ত্রী। (আশ্বস্ত) চুলোয় যাক সে। রাত জেগে মাথা গরম করে যত সব কুস্বপ্ন দেখা হচ্ছে। ওঠ। মাথা ধুয়ে শুতে যাবে চল। খাতাটা ছিঁড়ে ফেলে ভালোই করেছ। এখন আর প্রলাপ বকতে হবে না। ওঠ!

স্বামী। (খাতার পাতাগুলি আরও ছিঁড়িতে-ছিঁড়িতে—অন্যমনস্ক) কেনই বা মারব তাকে? মারবই বা কি সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে? (ছিন্ন খণ্ড-গুলি ছড়াইয়া ফেলিতে-ফেলিতে) তাকে আমি সুখী করব। ইচ্ছা করলে আমি কী না করতে পারি?

স্ত্রী। তাই কোরো। এখন ওঠ দিকি।

স্বামী। আবার নতুন করে লিখব।

স্ত্রী। (হাসিয়া) আবার নতুন করে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

স্বামী। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে-উঠিতে) তুমি ঠাট্টা করছ, মিনু, কিন্তু তাকে তো তুমি দেখনি। মৃত্যুকে সে উপেক্ষা করে, জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা বলে বিশ্বাস করে না।

স্ত্রী। কাজ নেই আমার দেখে। তোমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই—তিন শ পাতা বই লিখে মাথা-গরম করে ছিঁড়ে ফেললে। তখন

বললাম, এখানে একটু বসি, তা বসতে দিলে না। দেখতাম কে সে তারাপদ!

স্বামী। (দাঁড়াইয়া) তাকে দেখবার সৌভাগ্য সকলের হয় না, মিনু। চল, আমি যাচ্ছি।

(দক্ষিণের জানলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন)

স্ত্রী। আবার কী? তারাপদ তো চলে গেছে।

স্বামী। (জানলা হইতে ফিরিয়া) বাতিটা নিভিয়ে দাও, মিনু। তারাপদ আবার আসুক।

স্ত্রী। (যেন ভয় পাইয়া) না। তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দেবে নাকি?

স্বামী। এবার তাকে দেখে তোমার একটুও ভয় লাগবে না, বরং খুশি হয়ে নিজেই তার সঙ্গে আলাপ করবে। সে মৃত্যুর অন্ধকার ছেড়ে নব-জীবনের অমৃতলোকে এসে অবতীর্ণ হয়েছে। (টেবিল হইতে কলমটা তুলিয়া লইয়া) তাকে ডাকি। ভোর হতে এখনো অনেক দেরি।

স্ত্রী। (বাধা দিয়া) আজ আর নয়। কাল, দিনের বেলায়। এখন ঘুমুবে চল।

যবনিকা